কুরআনে কিয়ামাত ও শেষ বিচার
এবং জান্নাত ও জাহান্নামের

প্রকৌশলী মোঃ শামসুল হক চৌধুরী

কুরআনে কিয়ামাত ও শেষ বিচার
এবং
জান্নাত ও জাহান্নামের চিত্র

প্রকৌশলী মোঃ শামসুল হক চৌধুরী

প্রকাশনায়
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন ■ মগবাজার ■ বাংলাবাজার

কুরআনে কিয়ামাত ও শেষ বিচার এবং জান্নাত ও জাহান্নামের চিত্র

প্রকৌশলী মোঃ শামসুল হক চৌধুরী

ISBN : 978-984-8808-35-1

প্রকাশক

আহসান পাবলিকেশন

প্রকাশকাল

এপ্রিল-২০১২, বৈশাখ-১৪১৯, জমা. আউয়াল-১৪৩৩

প্রাপ্তিস্থান

১। আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (নীচতলা)
ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৬৭০৬৮৬

২। ১৯১ বড় মগবাজার, ওয়ারলেছ রেলগেট, ঢাকা

৩। ৩৮/৩ বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা

৪। আই.সি.ডি ১৪/৮ ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

৫। ই.সি.এস, সুবিদ বাজার, সিলেট

প্রচ্ছদ

নাসির উদ্দিন

মুদ্রণ

র‍্যাকস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স

২২৫/১ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

মূল্য : এক'শ ত্রিশ টাকা মাত্র

Qur-ane Qiamat O Shesh Bichar Abong Jannat O Jahannamer Chitro : Written by Md. Shamsul Haque Chowdhury, Published by Ahsan Publication, Katabon Masjid Campus, Dhaka-1000 First Edition December-2011 Price **Tk. 130.00** only (US$ 3.0; Euro 2.5)

AP-86

অভিমত

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম নাযিল হোক নবী মুহাম্মাদ (সা) এর উপর এবং তাঁর পরিবার, পরিজন ও সহচরদের উপর। অতপর, "কুরআনে কিয়ামাত ও শেষ বিচার এবং জান্নাত ও জাহান্নামের চিত্র" নামক গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও যুগোপযোগী গ্রন্থ, কারণ আল্লাহর একত্বের প্রতি ঈমানের পর পর পুনরুত্থান ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসের উপর ইসলামী আকীদাহ্র ভিত্তি স্থাপিত। কুরআনে যে কোন পাতা উল্টালেই পরকালের পাথেয় এবং শান্তি ও শাস্তির বর্ণনা পাওয়া যাবে। বহু আয়াতে ঈমান বিল্লাহ্র পর পরই আখিরাতের প্রতি ঈমানের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন সূরা বাকারায় আয়াত নং ৮ ও ১৭৭ ও সূরা আততালাক এর আয়াত নং ২। আখিরাতের প্রতি ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তির পরিপূর্ণ ইসলাম পালন করা খুবই সহজ। আখিরাতের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস যার যত প্রবল ইসলামের মুহাব্বত ও বিধিবিধান পালনে সে তত তৎপর ও অগ্রসর। পরকালের প্রতি ঈমান যার যত দুর্বল ইসলাম পালনে সে তত দুর্বল ও অনগ্রসর। এজন্য নবী (সা) ইসলামের অনেক বিধিবিধান পালনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন পরকালের প্রতি ঈমানের কথা বলে। যেমন : যে ব্যক্তি পরকালের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে। যে পরকালে বিশ্বাসী সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে। আজকের অধিকাংশ নামধারী মুসলমানের দ্বীনহীনতা বা দ্বীনবিমুখতার প্রধান কারণ পরকালের প্রতি অবিশ্বাস। নবী (সা) এর যুগের জাহিলী সমাজের লোকেরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস পোষণ করতো কিন্তু আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করতো না। তাইতো তারা সহজে ইসলাম গ্রহণ করত না। আমার মনে হয় সম্মানিত লেখক এ বইটি মুসলিম সমাজে পরকালের প্রতি ও পরকাল সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাসের দুর্বলতা এবং ঈমান ও ইসলাম চর্চায় দুর্বলতা লক্ষ্য করার দরুন সংকলন করতে উদ্যোগী হয়েছেন।

পরকাল বিষয়ে বেশীর ভাগ কুরআনের বর্ণনাই তুলে ধরেছেন তিনি। আশা করি পরবর্তীতে কুরআনের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় তাফসির ও আরো ছহীহ হাদীস থেকেও বর্ণনা তুলে ধরবেন। এতে করে আরো সুন্দরভাবে পরকাল ও জান্নাত জাহান্নামের চিত্রগুলো ফুটে উঠবে।

কুরআন থেকে যে বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে স্বচ্ছ হৃদয় সম্পন্ন যে কোন মুসলিমের হৃদয়ে তা রেখাপাত করবে। আল্লাহ্ গ্রন্থটির সংকলক জনাব প্রকৌশলী শামসুল হক সাহেবের জন্য পরকালের উত্তম পাথেয় হিসেবে কবুল করুন এবং এর মাধ্যমে মুসলিম সমাজের ব্যাপক ঈমানী উন্নয়ন সাধন করুন। আমীন।

শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
(লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)
মহাপরিচালক
ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইন্‌ষ্টিটিউট
উত্তরখান, ঢাকা।

অভিমত

আস্তিক ও নাস্তিক এবং ধার্মিক ও ধর্মনিরপেক্ষ লোকদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে, দ্বিতীয়োক্তরা যেখানে তাদের স্রষ্টা ও পরকাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ও বে-খবর থাকার দরুন বল্গাহীন স্বাধীন জীবন যাপন করে, সেখানে প্রথমোক্তদের পদে পদে স্রষ্টা ও আখিরাতের নাজাতের চিন্তা সাবধানী হতে বাধ্য করে। এক হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী :

"দুনিয়া তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে আর তোমরা সৃষ্ট আখিরাতের জন্য।"

কিন্তু তারপরও ঈমানদারদের অবস্থা এমন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফরমান :

"তোমরা দুনিয়ার জীবনকেই প্রধান্য দিয়ে থাক অথচ আখিরাতই হচ্ছে উৎকৃষ্টতর এবং সর্বাধিক স্থায়ী।" (আল কুরআন ৮৭:১৬-১৭)

যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ দুনিয়ার আত্মভোলা মানুষকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে আল্লাহ্মুখী ও আখিরাতমুখী করার প্রয়াস পেয়েছেন। আসমানী কিতাবসমূহ এ বার্তা নিয়েই পৃথিবীতে নাযিল হয়েছে।

আখিরাত দুনিয়ার তুলনায় কত বিশাল সে সম্পর্কে হাদীসের দুইটি উপমা স্মরণ পড়ে। একখানা হাদীসে বলা হয়েছে : সাগর জলে তোমার কনিষ্ঠ আঙ্গুল ডুবিয়ে তুলে দেখ সে কতটুকু পানি নিয়ে ফিরে এলো। এই এটুকুই তোমার দুনিয়ার জীবন, অবশিষ্ট সকল পানিই আখিরাত তুল্য (মুসলিম-৬৮৪৩)। অপর হাদীসে বলা হয়েছে : যদি একটি পাখিকে বলা হয় একশ বছর পরে একটি করে দানা খেতে থাক, এভাবে খেতে খেতে একদিন না একদিন দুনিয়া ভর্তি সর্ষেদানাও শেষ হয়ে যাবে (কেননা দুনিয়া তো একটা সীমাবদ্ধ স্থান মাত্র)। কিন্তু তারপরও আখিরাত শেষ হবে না।

আল কুরআনের আয়াতসমূহে এবং শত্রুদের দ্বারাও আল-আমীন বা সত্যবাদী খেতাবে ভূষিত মহানবী (সা) এর বিভিন্ন বাণীতে কিয়ামত এবং বেহেশত ও দোযখের যে বিবরণসমূহ এসেছে তার অনেকটাই প্রিয়বর ইঞ্জিনিয়ার

মোঃ শামসুল হক চৌধুরী ঝরঝরে বাংলায় উপস্থাপন করে একটা চমৎকার সওগাত পাঠককে উপহার দিয়েছেন। প্রথাগতভাবে আলিম বা মাদ্রাসা পড়ুয়া না হয়েও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন লোকের জন্য এটা একটি বেশ আয়াসসাধ্য ব্যাপার সন্দেহ নেই। এজন্য লেখকের এ উদ্যোগ প্রশংসার দাবী রাখে। আমি তাতে যৎসামান্য কলম বুলিয়ে দিয়েছি। আশা করি পুস্তকটি আমাদের ধর্মীয় শিক্ষাবঞ্চিত আত্মভোলা প্রজন্মকে আখিরাতমুখী করার পক্ষে বেশ সহায়ক হবে। আল্লাহ্ তাঁর এ খেদমতটুকু কবুল করুন দোয়া করি।

আব্দুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী
পেশ ইমাম ও খতিব, বাংলাদেশ সচিবালয়
সাবেক চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ জমিয়তুল মুদাররিসীন (১৯৭২)
ও সদস্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
সদস্য ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা বোর্ড
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

অভিমত

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করে তাদের জন্য দুটি জগত নির্ধারণ করেছেন। এর প্রথমটি হল দুনিয়ার জীবন বা জগত এবং অপরটি হল আখিরাতের জীবন। দুনিয়ার জীবন তথা পৃথিবী নামক এই জগত ধ্বংসের মাধ্যমে আখিরাত বা পরকালের জীবন শুরু হবে। ঐ জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। তার ব্যাপ্তি হবে হবে অনন্ত কাল। একজন মানুষ তখনই ঈমানদার হবেন যখন তিনি তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসী হবেন। যেহেতু কিয়ামাতের মাধ্যমেই আখিরাতের শুরু তাই কিয়ামাতে বিশ্বাস, পুনরুত্থানে বিশ্বাস, শেষ বিচারে বিশ্বাস ও বিচার শেষে মানুষের ঠিকানা জান্নাত কিংবা জাহান্নামে বিশ্বাস হল ঈমানের অপরিহার্য অংগ। মানুষের জীবনের সফলতা বা বিফলতা বলতে শেষ ঠিকানাই (destination) বুঝায়। অর্থাৎ জান্নাত হল সফলতা আর জাহান্নাম হল বিফলতা। আখিরাত বা পরকালের জবাবদিহিতা হল শেষ বিচার। মহান স্রষ্টা আমাদের প্রভু এমন এক মহাপরীক্ষার মাধ্যমে শেষ ফয়সালার ব্যবস্থা করেছেন যা থেকে বুদ্ধিমান, হুঁশিয়ার ও সতর্ক ব্যক্তিবর্গ ছাড়া নিস্তার লাভের সুযোগ নেই। একদিকে পার্থিব জীবনের মোহমায়া, সন্তান-সন্ততি ও সম্পদের প্রতি লোভ-লালসা, অপরদিকে আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয়ার জন্য শয়তান নামক চিরদুশমনের দেখানো প্রলোভন, এই দ্বিবিধ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে শুধু তারাই যারা শেষ পরিণতি সম্পর্কে সচেতন ও সজাগ।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তাঁর বাণী তথা কিতাবের মাধ্যমে কিভাবে কিয়ামাত ও শেষ বিচার সংঘটিত হবে তার চিত্র এবং সর্বশেষ জাহান্নাম অথবা জান্নাত প্রাপ্তির যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা যদি একজন মুমিন কিংবা যে কোন মানুষ জানতে ও বুঝতে পারে তাহলে কোন শক্তিই তাকে গাফিল করতে পারবে না। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরায় এই বিষয়গুলির হৃদয়স্পর্শী বহু আয়াত নাযিল হয়েছে। এই বিষয়গুলির আয়াতসমূহ এবং এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পর্কিত বহু তাফসীর, হাদীস ও পুস্তকাদিও বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে। কিন্তু লেখক এই

বইয়ে একই সঙ্গে কিয়ামাত থেকে শুরু করে শেষ বিচার ও ফলাফল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কুরআনের আলোকে অতি চমৎকারভাবে সেগুলি সন্নিবেশিত করেছেন যা পাঠক মাত্রেরই হৃদয় স্পর্শ করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ ক্ষেত্রে লেখক ইখলাছের সাথে যে কঠিন একটি দায়িত্ব পালন করেছেন সেজন্য জাযা কেবল আল্লাহ্ তা'আলার দরবারেই রয়েছে। তাঁর সব শ্রম ও সময় আল্লাহ্ কবুল করুন। তাঁর এই কঠোর সাধনা তখনই সঠিক সার্থক হবে যখন পাঠক বইটি পড়ে পরকালের সওদা করার কাজে আগুয়ান হবেন।

আমি এই পুস্তকটির বহুল প্রচার ও প্রসারের জন্য মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করছি এবং দুনিয়া-আখিরাতে আমাদের কামিয়াবির জন্য তাঁর দরবারে তওফিক কামনা করছি। ওমা তওফিকী ইল্লা বিল্লাহ্।

আহকার
আলহাজ মাওলানা কাজী আবু হোরাইরা
খতিব
মসজিদ-ই বায়তুল হারাম, লালমাটিয়া,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলা ভাষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও যুগোপযোগী গ্রন্থ 'কুরআনে কিয়ামাত ও শেষ বিচার এবং জান্নাত ও জাহান্নামের চিত্র' জনগণের কাছে পৌঁছাতে পেরে মহান ক্ষমতাধর, পরম দয়ালু আল্লাহর প্রশংসা আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ। সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হযরত মুহাম্মাদের (সা) প্রতি অসংখ্য দরূদ পাঠ করছি, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠভাবে মানবজাতির কাছে পরকাল (here after), কবর, কিয়ামাত, শেষ বিচার, পুলসিরাত, জাহান্নাম ইত্যাদির ভয়াবহতা বিষয়ে কঠোর সতর্কবাণী করেছেন এবং জান্নাতের অনন্ত জীবনের আনন্দের ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছেন।

ইসলামী আকীদাহ বা বিশ্বাসের ৬টি অংশের অন্যতম হল, পরকালের (আখেরাতের) প্রতি বিশ্বাস। পরকালের চিত্রের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত ও অনেক ছহীহ হাদীস রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, "হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় কর। নিশ্চয়ই কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়াবহ ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা দেখবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী মা দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে। প্রত্যেক গর্ভবতী নারী গর্ভপাত করবে। তুমি মানুষকে দেখবে নেশাগ্রস্ত মাতাল, যদিও তারা মাতাল নয়। বস্তুত আল্লাহর শাস্তি ভয়াবহ।" (সূরা হজ্জ, ১-২)

"সূর্য আলোহীন হয়ে পড়বে। নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে। যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে। যখন দশ মাসের গর্ভবতী উট উপেক্ষিত হবে..." (তাকভীর, ১-৪)। "যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে। নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে। যখন সমুদ্রকে উত্তাল করা হবে। কবরকে খুলে দেয়া হবে..." (ইনফিতর, ১-৪)। "যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে। তার গর্ভে যা আছে তা বের করে খালি হয়ে যাবে..." (ইনশিকাক, ৩-৪)।

জাবির বিন আবদিল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, 'কিয়ামাতের দিন পৃথিবীকে চামড়ার বা রাবারের মতো টেনে সম্প্রসারিত করা হবে। এরপরেও

পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব মানুষ একত্রিত হওয়ার কারণে এক একজনের শুধু পা রাখার স্থান ভাগে পড়বে।' (তাফসীরে মাযহারী, মাআরেফুল কুরআন)। আখিরাতের জবাবদিহিতার ভয় যার যত গভীর হবে বিশুদ্ধ আমলের ব্যাপারে সে তত সতর্ক ও অগ্রসর হবে।

On the other hand (অন্যদিকে) যার পরকালের প্রতি বিশ্বাসের গভীরতা কম হবে তার দ্বারা পূর্ণাঙ্গ ইসলাম চর্চায় প্রচুর দুর্বলতা দেখা যাবে। সে বল্গাহীন, কুপ্রবৃত্তির চাহিদানুযায়ী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হবে।

উমার বিন আবদিল আযীয় (র) বলেন, 'পরকাল বা বিচারকে যারা বিশ্বাস করে তারা নির্বোধ আর যারা অবিশ্বাস করে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত।' নির্বোধ বলার কারণ হল, তারা বিশ্বাস করে অথচ আখিরাতের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে না।

মাননীয় লেখক প্রকৌশলী হয়েও এ গ্রন্থে পরকালের যে পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তা পরকাল বিশ্বাসী অমনোযোগী মুমিনদের আবার পূর্ণ মনোযোগী করে তুলবে ও এর যথার্থ প্রস্তুতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বাংলাদেশ টেলিভিশনের ইসলামী আলোচক, লেখক মোঃ মাসুম বিন রেজাকে ধন্যবাদ জানাই গ্রন্থটি দেখে দেয়ার জন্য এছাড়াও এ গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচারের সাথে যুক্ত সবাই যেন আখিরাতের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে সে দু'আ করছি। আল্লাহ হাফিয।

মুহাম্মদ গোলাম ছরওয়ার
বিনীত প্রকাশক

সূচীপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সহচরবৃন্দের প্রতি।

কুরআনের ভাষাকে মিসরের পণ্ডিত সায়্যিদ কুতুব স্পষ্ট চিত্রধর্মী বলে মন্তব্য করেছেন। বস্তুত কুরআনে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি-বৈচিত্র, ইহ ও পরকালে পুণ্যবান ও পাপীদের বিপরীতধর্মী আচরণ, কিয়ামাত দিবসের ঘটনাবলী ও ভয়ঙ্কর অবস্থা এবং বেহেশ্‌ত ও দোযখের অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা আমাদের মানসপটে যেন এক একটি জীবন্ত ও চলন্তরূপ নিয়ে হাজির হয়। কোন চিত্রের একটি অভিব্যক্তির ভিতর যেমন হাজারো কথা লুকিয়ে থাকে, চিত্রধর্মী বর্ণনায় তেমনি হাজারো ছবি পর পর মানসপটে সংযোজিত হয়ে একটি পূর্নাঙ্গ চলমান দৃশ্যের রূপ লাভ করে ।

পবিত্র কুরআন মানুষের জীবন ব্যবস্থার এক পরিপূর্ণ গঠনতন্ত্র। মানুষের সৎপথে চলার এবং বিপথগামিতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য যা-কিছু জ্ঞানের প্রয়োজন তার সবই কুরআনে আছে। কুরআনের সবচাইতে আলোচিত বিষয় হচ্ছে কিয়ামাত দিবসের চিত্র এবং তা অবশ্যই দারুণ এক ভয়াবহ চিত্র। কুরআন নাযিল হয়েছে মূলত এই মহাসংকটের দিন সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করতে এবং কিভাবে সেই সংকট থেকে মানুষ রেহাই পেতে পারে তার স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দিতে। কেননা মানুষের ইহকালের যা-কিছু প্রচেষ্টা, যা-কিছু অর্জন তার সবই ঐ একটি দিনের চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশে তার চরম পরিণতিকে নির্ধারিত করে দেবে। সেই পরিণতির মাত্র দুটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করে রেখেছেন মহাবিচারক আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। বিচারে উত্তীর্ণ সফলকাম মানুষ প্রবেশ করবে অনন্ত জীবনের জান্নাতে, যেখানে তারা আল্লাহ্‌র অসীম নিয়ামাতরাজি উপভোগ করে চির শান্তিতে থাকবে; আর ব্যর্থকাম তথা পাপী লোকরা স্থান পাবে জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুনে, যেখানে তারা চিরকাল ধরে ভয়ঙ্কর শাস্তি ভোগ করতে থাকবে, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌ তাদের কাউকে ক্ষমা করে দেন।

কিন্তু মানব জাতির দুর্ভাগ্য, ইহকালের সকল কর্মই যে সেই মহাবিচারের দিনের সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে করা উচিত এই আসল জ্ঞানই অধিকাংশ মানুষের নেই। যাদের আছে, তাদের মধ্যেও সেই দিনের জন্য যথার্থ প্রস্তুতির উদ্যোগ নেই। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেছেন, 'মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে (২১:১)। এজন্যই কুরআনে শেষ বিচারের দিন ও তার ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা মানুষকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে কুরআনের আয়াত - ৪১:৫৪ এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন যে, খলীফা উমার ইবনে আবদিল আযীয (রা) একদা জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "বিচার দিবস সম্পর্কে আমি খুব চিন্তা-ভাবনা করে যা বুঝেছি তা এই যে, যারা এটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে তারা নির্বোধ এবং যারা এটাকে মিথ্যা মনে করে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত।" ইবনে কাসীর বলেন, তাঁর 'যারা এটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে তারা নির্বোধ' এই কথার ভাবার্থ এই যে, তারা এটাকে সত্য মনে করছে অথচ এর জন্য কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করছে না। এর অন্তর প্রকম্পিতকারী ও ভয়াবহ অবস্থা হতে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকছে, একে ভয় করে এমন আমল করে না যা ঐ দিনের ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান করতে পারে। এরা নিজেদেরকে কিয়ামাত সংঘটনের সত্যতা স্বীকারকারীও বলছে আবার খেল-তামাশা, অবহেলা, কুপ্রবৃত্তি, পাপ ও নির্বুদ্ধিতার মধ্যে নিমজ্জিত থাকছে, আর এদিকে কিয়ামাত নিকটে চলে আসছে।

কিয়ামাতের উপর বিশ্বাস আনা ঈমানের মৌলিক বিষয়ের মধ্যে একটি। (ঈমান সম্পর্কে চতুর্থ অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে)। এতে সামান্যতম অবিশ্বাস বা সন্দেহ জন্মালে মানুষ আর মু'মিন হিসেবে গণ্য হয় না। তথাপি বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে অনেকের মনে এরকম প্রশ্নের উদয় হয়ে থাকে যে, কেনই বা আমার এ-জগতে আসা, কোথা থেকে আসা, কোথায় আমার চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল, কিংবা কেন আমাকে একটি শেষ বিচারের সম্মুখীন হতে হবে? আর এ ধরনের প্রশ্নের একমাত্র সঠিক উত্তর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কুরআনেই দিয়ে রেখেছেন।

এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে উপরের প্রশ্নাবলীর কুরআন-ভিত্তিক উত্তর দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কুরআনে বর্ণিত কিয়ামাতের শুরু বা সৃষ্টির ধ্বংস পর্ব সম্পর্কিত বিশিষ্ট আয়াতসমূহ এবং তৃতীয় অধ্যায়ে কিয়ামাতের দ্বিতীয় বা

পুনরুত্থান ও বিচারপর্ব সম্পর্কিত আয়াতসমূহ উদ্ধৃত করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে কিয়ামাত দিবসে সাফল্য লাভের দিকনির্দেশনা তথা তৌহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও ঈমান-আমল সম্পর্কিত কিছু আয়াত এবং কুরআনে বর্ণিত সবচাইতে বড় পাপ ও পাপীদের পরিচিতি সম্পর্কিত কিছু আয়াত স্থান পেয়েছে। পঞ্চম বা পরিশিষ্ট অধ্যায়ে জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে যৌক্তিক ধারণা এবং কুরআনে বর্ণিত মূল বিষয়াবলীর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকাও স্থান পেয়েছে।

উদ্ধৃত আয়াতসমূহের অনুবাদ মূলতঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর 'কুরআনুল করিম' নামক বাংলা অনুবাদ গ্রন্থের অনুবাদ ভিত্তিক। তবে সেই গ্রন্থে অনেকটা 'শাব্দিক অনুবাদের' যে রীতি অনুসরণ করা হয়েছে তার পরিবর্তে এই বইয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুবাদ ও ভাবার্থের সমন্বয়ে এবং আরো যথাযথ শব্দ চয়ণ করে অনুবাদকে অধিকতর বোধগম্য ও সহজ পাঠ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে আরো কিছু তাফসীর গ্রন্থেরও সাহায্য নেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ইব্‌নে কাসীরের বাংলা ও আল্লামা ইউসুফ আলীর ইংরাজী অনুবাদ ও তাফসীরও অন্তর্গত। অনুবাদ যাতে পুরোপুরি বিশ্বস্ত থাকে সে ব্যাপারে পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে।

অনুবাদ পুরোপুরি বিশ্বস্ত আছে কি না তা নিশ্চিত করতে সউদি আরব থেকে সরকারীভাবে প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরণকৃত কুরআনের ইংরাজী অনুবাদ The Noble Quran এর ইংরাজী অনুবাদের সঙ্গে তুলনা করেও যাচাই করা হয়েছে।

বইয়ে উদ্ধৃত আয়াতসমূহ অর্থের দিক দিয়ে খুবই স্পষ্ট। তথাপি অতিরিক্ত পাঠ্য হিসেবে ইবনে কাসীর ও আল্লামা ইফসুফ আলীর তাফসীরগ্রন্থদ্বয় থেকে তাঁদের ব্যাখ্যা ও মন্তব্য এবং প্রয়োজনবোধে আনুষঙ্গিক ছহীহ্‌ হাদীসের সারসংক্ষেপও উদ্ধৃত করা হয়েছে। যে সকল হাদীসের সংকেত নম্বর দেয়া হয়নি সেগুলি ইবনে কাসীর এর তাফসীরগ্রন্থ থেকে সরাসরি উদ্ধৃত করা হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। কিছু জায়গায় কুরআনের আয়াতে বর্ণিত ঘটনা বা পরিস্থিতির ব্যাপারে আমার নিজস্ব কিছু বক্তব্য স্থান পেয়েছে যা নেহায়েতই ঘটনার যুক্তিভিত্তিক বা 'বিজ্ঞান'-ভিত্তিক পর্যালোচনা মাত্র এবং যা কোন আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবেও উপস্থাপিত হয় নি কিংবা ঈমান ও আকীদার সঙ্গে সাংঘর্ষিক চিন্তাপ্রসূতও নয়। এসব আলোচনায় ধারণাগত কোন ভুলত্রুটি থাকলে তার দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার নিজের।

বইয়ের কলেবর সীমিত রাখতে এতে উদ্ধৃত সকল আয়াতের বাংলার সাথে আরবী উদ্ধৃত না করে কেবল অধিক পঠিত/পরিচিত কিছু আয়াতের বাংলার উপরে আরবী উদ্ধৃত করা হয়েছে।

বইটিতে কুরআনুল কারীম থেকে কিয়ামাত ও অন্যান্য উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কিত মোট প্রায় ৫০০ টি আয়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং উৎসুক পাঠকের জন্য আরো প্রায় ৪০০ টি আয়াতের নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া যে সকল ক্ষেত্রে কোন আয়াতের বা কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা কিংবা উদাহরণ দেয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হাদীস বা হাদীসের সারসংক্ষেপ উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ রকম হাদীসের সংখ্যা প্রায় ১০০।

এই পুস্তক মানুষকে পরকাল সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে এবং নিজের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে সাহায্য করবে এবং মূল কুরআন ও তাফসীর পড়ে সঠিক লক্ষ্য হাসিলে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এই কামনা ও আশা রাখি।

শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম, মোঃ এনামুল হক (মেরিন ইঞ্জিনিয়ার), মাওলানা আব্দুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী এবং আলহাজ মাওলানা কাজী আবু হোরাইরা বইটির পাণ্ডুলিপি পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করত আমাকে মূল্যবান ও যথাযথ পরামর্শ দান করেছেন। এ জন্য আমি তাঁদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সকলের ও আমার প্রচেষ্টা সফল করুন।

দ্রষ্টব্য : আরবী (ও অন্যান্য) ভাষায় 'আমি' এর স্থলে সম্মানার্থে 'আমরা' সর্বনাম ব্যবহারের রীতি প্রচলিত আছে। আরবী ভাষার এই রীতি অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে অনেক আয়াতে 'আমি' এর স্থলে নিজেকে 'আমরা' সর্বনামে উপস্থাপন করেছেন। এই পুস্তকে উদ্ধৃত আয়াতসমূহের অনুবাদে কুরআনের রীতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং বাঁকা অক্ষরে '*আমরা*, '*আমাদের*' এভাবে লিখা হয়েছে)।

প্রথম অধ্যায়

মানব জাতির সৃষ্টি ও তার খিলাফাত লাভ

১.১। মানবজাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও সৃষ্টি-রহস্য

সৃষ্টির শুরু কোথায় এবং শুরু থেকে চলতে থাকা সৃষ্টির কোন প্রকৃত 'শেষ' আছে কি না, তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন, মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীর তা জানার ক্ষমতা কিংবা উপায় নেই। একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ইচ্ছায় যখন যা খুশী সৃষ্টি করেন এবং যখন খুশী তা ধ্বংস করেন। সব সৃষ্টি তাঁরই, সব কর্তৃত্ব তাঁরই এবং সব কিছুর একমাত্র মালিক ও প্রতিপালক তিনিই। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে মহাকাশে যে কোটি কোটি ছায়াপথ এবং প্রত্যেকটি ছায়াপথের মধ্যে আমাদের সূর্যের তুলনায় ছোট বড় হাজার হাজার কোটি জ্বলন্ত নক্ষত্র বিরাজ করছে এবং যেগুলির দূরত্ব এই পৃথিবী থেকে হাজার হাজার থেকে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে - এসবই তাঁর সৃষ্টি। এই সৃষ্টির ব্যাপ্তি সম্বন্ধে মানুষের ধারণা করারও কোন শক্তি নেই। যন্ত্রপাতির সাহায্যে মানুষ মহাকাশের যতটুকু পরিধি অবলোকন করতে পেরেছে সেটুকুর মধ্যে আমাদের এই সৌরজগত যেন মহাসমুদ্রের মধ্যে এক ক্ষুদ্র জলবিন্দু মাত্র। যন্ত্রপাতির 'দৃষ্টিশক্তি'ও সীমিত আর বৈজ্ঞানিকরাও ধারণা করেন যে, মহাবিশ্বের ব্যাপ্তি দিন দিন বিস্তার লাভ করছে। অর্থাৎ স্রষ্টার সৃষ্টিকর্ম থেমে নেই। অপর দিকে তাঁর কোন সৃষ্টি নিশ্চলও নেই, প্রত্যেক বস্তুই আপন পথে নিত্য চলমান। বৈচিত্রময় এই মহাবিশ্ব আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ক্ষমতা ও সৃষ্টি নৈপুণ্যেরই নিদর্শন। (সৃষ্টি তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক সূত্র 'বিগ ব্যাং' সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শরীফে বলেছেন :

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ.

২১:৩৩। আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র; (এদের) প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষ পথে বিচরণ করে। (অনুরূপ : ৩৬:৩৬ ~ ৩৬:৪০)

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَأٰيٰتٍ لِّأُولِى الْأَلْبَابِ. الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

৩:১৯০। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাত্রির আবর্তনের মধ্যে নিঃসন্দেহে জ্ঞানবান লোকদের জন্য রয়েছে প্রচুর নিদর্শনাবলী,

৩:১৯১। যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি (নৈপুণ্য) সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে, (এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা বলে উঠে,) 'হে আমাদের প্রতিপালক, (সৃষ্টি জগত) এর এসব কিছু তুমি নিরর্থক সৃষ্টি করোনি; তোমার পবিত্রতা ও মহত্ত্ব ঘোষণা করছি, অতএব তুমি আমাদিগকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর'।

মহাবিশ্বের সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ্ তা'আলার নিজস্ব উদ্দেশ্য এবং এক মহাপরিকল্পনা নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। মানব জাতির সৃষ্টি আল্লাহ্র সেই মহাপরিকল্পনার একটি অংশ বিশেষ। মানব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতা ও জ্বিন জাতিসহ আরো অনেক প্রাণী সৃষ্টি করেছেন যাদের মধ্যে একমাত্র জ্বিন জাতি ছাড়া আর কারো ইচ্ছার স্বাধীনতা ছিল বলে আমাদের জানা নেই। তার পর আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলেন তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করবেন পৃথিবীর উপাদান (মাটি) দিয়ে এবং পৃথিবীর খিলাফাতের দায়িত্ব থাকবে মানবজাতির উপর। এ দায়িত্ব পালনের পরিপ্রেক্ষিতে জ্বিন জাতির মত তাদেরকেও দেয়া হবে ইচ্ছার সীমিত স্বাধীনতা। তারা আল্লাহ্র অনুগত থেকে সার্বিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করবে, তবে ইচ্ছা করলে তারা আল্লাহ্র অবাধ্যও হতে পারবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِيْنَ. مَا خَلَقْنٰهُمَآ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ.

৪৪:৩৮। *আমরা* আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যকার কোন কিছুই খেল-তামাশার ছলে সৃষ্টি করিনি,

৪৪:৩৯। এগুলোকে *আমরা* যথাযথ উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি করিনি, কিন্তু মানুষের অধিকাংশই (সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে) কিছুই জানে না।

এবং – وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ.

৫১:৫৬। আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে (কেবল) এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমারই ইবাদাত বা দাসত্ব করবে। (অনুরূপ আরো আয়াত : ৩৮:২৭, ২৩:১১৫-১১৬)।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর নিজের কোন প্রয়োজনে মানব ও জ্বিনকে সৃষ্টি করেননি, কেননা তিনি সকল প্রয়োজন থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এইজন্য যে, তারা নিজেদের লাভ ও উপকারের জন্য আল্লাহ্র নির্দেশিত পন্থায় কেবল তাঁরই ইবাদাত করবে।

আর তাদের সুবিধা ও সেবা দানের উদ্দ্যেশ্যে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলকে প্রস্তুত করা হলো– পৃথিবীর মাটি, গাছ পালা, জীব-জন্তু, মাটির ভিতরের এবং সমুদ্রের নীচের হাজারো রকমের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সম্পদরাশি এবং এমনকি আকাশের চন্দ্র-সূর্য ও মহাকাশের নক্ষত্ররাজিও তৈরী হয়ে থাকল মানব জাতির পৃথিবীতে থাকাকালীন সময়ের সকল প্রয়োজন মিটাতে এবং তাদেরকে সকল প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করতে। (বৈজ্ঞানিকরা মাটির নীচে প্রাপ্ত জীবাশ্ম পরীক্ষা করে অনুমান করেছেন যে, মানব সৃষ্টির প্রায় ৫০ কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণীর আবির্ভাব শুরু হয়)। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,
২:২৯। আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন সমস্ত কিছু যা পৃথিবীতে আছে; অতপর তিনি আকাশের দিকে মনঃসংযোগ করেন এবং তা সপ্ত আকাশে সুবিন্যস্ত করেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত।

৪৫:১২। আল্লাহ্ তা'আলাই সেই (মহান সত্তা), যিনি সমুদ্রকে তোমাদের কল্যানে নিয়োজিত রেখেছেন, যাতে তাঁরই আদেশক্রমে তাতে (তোমাদের) নৌযানসমূহ চলতে পারে ও যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার এবং যেন তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পার।

৪৫:১৩। এবং (একইভাবে) তিনি নিজ অনুগ্রহে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত

করে দিয়েছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছুকেই; নিশ্চয়ই এর মধ্যে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য (অনেক) নিদর্শন বিদ্যমান।

মানুষকে আল্লাহ্ এই পৃথিবীতে চিরঞ্জীব হয়ে থাকার জন্য সৃষ্টি করেননি। তাই তিনি জন্ম ও মৃত্যু উভয় প্রক্রিয়া সৃষ্টি করলেন, যাতে প্রত্যেক মানুষ পৃথিবীতে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বেঁচে থেকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে এবং পুনরুত্থানের নির্ধারিত দিবসে সকলে পুনরুত্থিত হয়ে ইহজীবনের নিজ নিজ কৃতকর্মের জবাবদিহিতা করবে এবং কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রত্যেকে পুরস্কার অথবা শাস্তি পাবে। সৃষ্টির এই উদ্দেশ্য কুরআনে আরো অনেক আয়াতসহ নিম্নোক্ত আয়াতগুলিতে বর্ণিত হয়েছে :

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً-وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ.

৬৭:২। (আল্লাহ্ সেই মহামহিমান্বিত সত্তা) যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম; তিনি পরাক্রমশালী, অসীম ক্ষমাশীল।

উত্তম কর্ম হচ্ছে সেই কর্ম যা ঈমানের সাথে করা হয়, একমাত্র আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য করা হয় এবং তাঁর ও তাঁর রাসূল (সা) এর নির্দেশিত ও প্রদর্শিত পন্থায় করা হয়। আল্লাহ্র কাছে অধিক কর্ম নয়, বরং এই উত্তম কর্মই অধিক গ্রহণীয়।

لَخَلْقُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ.

৪০:৫৭। অবশ্যই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করা মানুষকে সৃষ্টি করা অপেক্ষা কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।

অর্থাৎ মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান করাও আল্লাহ্র জন্য অতি সহজ কাজ, কেননা তিনি মহাবিশ্বের আরো বহুগুনে বড় ও জটিল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। আর যে মানষকে তিনি এই পৃথিবীর মাটির উপাদান থেকে তৈরী করেছেন সে মানুষকে পুনরায় তৈরী করা তো আরো সহজ।

আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে মানুষকে সৃষ্টি করত সরাসরি পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিতে পারতেন এবং এটাই স্বাভাবিক হত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু মানুষ সৃষ্টির পেছনে তাঁর যে মহাপরিকল্পনা কাজ করছিল তার মধ্যে এও ছিল যে, তাঁর সৃষ্টির মধ্যকার বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে কে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের উপযোগী তা পরীক্ষার

মাধ্যমে প্রমাণ করা। অপরদিকে মানব জাতিকে বুঝিয়ে দেয়া যে, তার পৃথিবীর খিলাফাত পাওয়া কোন কুসুমাস্তীর্ণ পথ নয়, বরং তাকে সারাজীবন এক মহাশত্রুর মোকাবেলায় সংগ্রাম করে তবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন ও প্রমাণ করতে হবে। সর্বোপরি সৃষ্টির সবাইকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয়া যে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনই একমাত্র আ'লিমুল গাইব, ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন অনুমান করাও আর কারো সাজে না এবং তিনি কোন বান্দার অহংকার বা অবাধ্যতাকে ক্ষমা করেন না, যদি না বান্দা সবিনয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

আল্লাহ্ তা'আলা যে অসীম দয়ালু (আর্-রাহমান), তাঁর এই মহিমান্বিত প্রকৃতি তিনি এভাবে দেখাতে চাইলেন যে, মানব জাতি কোন যোগ্যতা অর্জনের পূর্বেই তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে সারা বিশ্বের সকল বস্তুর উপকার ও সেবা পাওয়ার সুযোগ নিয়ে সৃষ্ট হল।

তিনি যে অসীম দয়াবান (আর্-রাহীম), তা তিনি দেখাতে চাইলেন মানুষের জন্য তাঁর অসীম অনুগ্রহের দ্বার সর্বদা খোলা রেখে, যাতে মানুষ তাঁর উপর বিশ্বাস ও আস্থা রেখে পরকালের জন্য যা চাইবে তা-ই তিনি তাকে দেবেন, এমন কি তার চাইতে বহু গুন বেশীও দেবেন।

তিনি যে অসীম ক্ষমাশীল (আল-গাফুর) তা তিনি দেখাতে চাইলেন এমন এক (মানব) জাতিকে সৃষ্টি করে, যারা ভুল করার প্রবণতা নিয়ে জন্মাবে, ভুল করবে এবং তাঁর কাছে অনুগ্রহ ও ক্ষমা চাইবে, যাতে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।

ফিরিশতাদের মত যারা কোন ভুল, পাপ বা অবাধ্যতা করার ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়নি, তাদের প্রতি এসব অনুগ্রহ দেখানোর সুযোগ সৃষ্টি করা হয়নি।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সকল একক গুণ ও ক্ষমতার কিছু নিদর্শনকে তাঁর এক নূতন সৃষ্ট জীবের কাছে প্রকাশ করতে চাইলেন - মানব সৃষ্টির পেছনে এও ছিল তাঁর এক অভিপ্রায়।

হাদীসে আছে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'যাঁর হাতে আমার জীবন, সেই মহান সত্তার কসম, যদি তোমরা গুনাহ্ না-ই করতে, তা হলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিয়ে যেতেন এবং তোমাদের স্থলে এমন এক জাতিকে আনতেন যারা গুনাহ্ করে আল্লাহ্র কাছে মাফ চাইতো। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের মাফ করে দিতেন।' (সহীহ্ মুসলিম-৬৬২০-৬৬২২)।

১.২। মানব জাতির সৃষ্টি প্রক্রিয়া ও তার সর্ব প্রথম পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া

মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া :

আল্লাহ্ তা'আলা তাই তাঁর সৃষ্টি-বৈচিত্রের নূতন এই জাতির সৃষ্টির কথা ঘোষণা করে দিলেন এবং তাদেরকে পৃথিবীতে খিলাফাতের দায়িত্ব দেবার প্রক্রিয়া শুরু করলেন। খিলাফাত এর অর্থ হচ্ছে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে পরবর্তী প্রজন্মের লোকদের তাদের পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ধারা, যা পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে। কুরআনুল কারীমের ভাষায় :

১৫:২৬। *আমরা* মানুষকে সৃষ্টি করেছি ছাঁচে ঢালা কাদার শুষ্ক ঠনঠনে মাটি থেকে,

১৫:২৭। আর ইতিপূর্বে *আমরা* জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি আগুনের উত্তপ্ত শিখা থেকে।

১৫:২৮। স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাগণকে বললেন, আমি ছাঁচে ঢালা কাদার শুষ্ক খনখনে মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, -

১৫:২৯। যখন আমি তাকে *সুগঠিত* ও সুঠাম করব এবং আমার পক্ষ থেকে তাতে রূহ ফুঁকে (জীবন সঞ্চার করে) দেব, তখন তোমরা সবাই (ফিরিশতা, জ্বিন ইত্যাদি) তার সামনে (সম্মান দেখাতে) সিজদাবনত হয়ে যাবে।

[অনুরূপ আয়াত ৩৮:৭১ থেকে ৩৮:৭৪ দ্রঃ]

২:৩০। স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাগণকে বললেন, আমি পৃথিবীতে খলীফা (প্রতিনিধি) সৃষ্টি করছি, তারা বলল, তুমি কি এমন কাউকে সেখানে সৃষ্টি করবে, যে অশান্তি ঘটাবে এবং রক্তপাত করবে? (অথচ) আমরাইতো তোমার সপ্রশংস স্তুতিগান করছি এবং তোমার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি। (তখন) আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, আমি নিশ্চয় (সে সব বিষয়) জানি, যা তোমরা জান না।

২:৩১। আর তিনি আদমকে যাবতীয় জিনিসের নাম (প্রকৃতি ও গুণাগুণ) শিখিয়ে দিলেন, পরে তা ফিরিশতাদের সামনে উপস্থিত করলেন এবং বললেন, যদি তোমরা (আদম সম্পর্কিত তোমাদের আশংকার ব্যাপারে) সত্যবাদী হও, তাহলে এ সবগুলির নাম (ও প্রকৃতি) বর্ণনা কর।

২:৩২। তারা বলল, তুমি মহান, পবিত্র (হে আল্লাহ্!), আমাদেরকে তুমি যা

শিক্ষা দিয়েছ তা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নেই। তুমিই একমাত্র জ্ঞানী, একমাত্র প্রজ্ঞাময়।

২:৩৩। আল্লাহ্ তা'আলা (তখন আদমকে) বললেন, 'হে আদম! তাদেরকে তুমি এগুলির নাম বলে দাও।' আদম তাদেরকে সেগুলির নাম যখন বলে দিল তখন তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমিই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর যাবতীয় গোপন ও অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত এবং তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর আর যা কিছু গোপন রাখ আমি তাও জানি।'

২:৩৪। আর যখন *আমরা* ফিরিশতাদেরকে বললাম, আদমকে (সম্মানার্থে) সিজদা করো, তখন কেবল ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদাবনত হলো; সে (সিজদা করতে) অস্বীকার করল এবং অহংকার করল, ফলে সে কাফিরদের (আল্লাহ্র নাফরমানদের) অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

৩৮:৭৫। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি তার প্রতি সিজদাবনত হতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না কি তুমি উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন কেউ?

৩৮:৭৬। সে বলল, আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠতর! তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ আগুন থেকে আর তাকে সৃষ্টি করেছ কাদা থেকে।

৩৮:৭৭। তিনি বললেন, তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও, নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত ও অভিশপ্ত।

৩৮:৭৮। আর তোমার উপর আমার অভিশাপ বহাল থাকবে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত।

৩৮:৭৯। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তবে (মৃতদের) পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দাও।

৩৮:৮০। তিনি বললেন, তোমাকে অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করা হলো;

৩৮:৮১। অবধারিত সময় (কিয়ামাত) উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।

৩৮:৮২। সে বলল, 'তোমার ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের (মানব জাতির) সকলকেই বিপথগামী করব' -

৩৮:৮৩। কেবল তোমার একনিষ্ঠ বান্দাদের ব্যতীত।

৩৮:৮৪। আল্লাহ্ বললেন, তবে এটাই সত্য ও ন্যায়সঙ্গত, আর আমি সত্য ও ন্যায়সঙ্গত কথাই বলি, (তা হচ্ছে), -

৩৮:৮৫। তোমার দ্বারা এবং (তাদের মধ্যকার) তোমার অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবই।

(৭:১১ থেকে ৭:১৫ পর্যন্ত এবং ১৫:৩২ থেকে ১৫:৪৩ পর্যন্ত আয়াতসমূহও উপরের ১১ টি আয়াতের অনুরূপ)

৭:১৬। (ইবলীস) বলল, যেহেতু তুমি আমাকে (আদমের কারণে) পথভ্রষ্ট করেছ সেজন্য আমিও তোমার সরল পথে তাদের (পথভ্রষ্ট করার) জন্য ওঁৎ পেতে বসে থাকব, -

৭:১৭। তৎপর আমি (তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে) তাদের নিকট অবশ্যই আসব - তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক থেকে; ফলে তুমি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞতা আদায়কারী (হিসেবে দেখতে) পাবে না।

(উপরের আয়াতে 'সামনের দিক থেকে আসব' এর অর্থ পরকাল সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেব, 'পশ্চাৎ দিক থেকে আসব' অর্থ দুনিয়ার আসক্তির প্রতি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করব, 'ডান দিক থেকে আসব' অর্থ দ্বীনের আদেশ তাদের কাছে সন্দেহপূর্ণ করে তুলবো এবং 'বাম দিক থেকে আসব' অর্থাৎ পাপ ও অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপ তাদের জন্য যোগ্য ও গ্রহণীয় বানিয়ে দেব।) - ইবনে কাসীর

উদ্ভূত ঘটনাবলীর পর্যালোচনা :

আদম (আ) সৃষ্টির বিষয়কে কেন্দ্র করে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হলো তা পর্যালোচনার বিষয় বটে। উপরের ২:৩০ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে ফিরিশতারা কোনভাবে (সম্ভবতঃ একদল জ্বিনের অবাধ্যতা ও অনাসৃষ্টির কর্মকাণ্ড দেখে) এমন কিছু জ্ঞান লাভ করেছিল যা দ্বারা তারা জানত যে, ইচ্ছা বা কর্মের কোন রকম স্বাধীনতা নিয়ে কোন জীব জন্মালে সেই স্বাধীনতাই তার জন্য বড় বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে। এজন্য তারা আশ্চর্য হয়েই জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি কি এমন কাউকে সেখানে সৃষ্টি করবে, যে অশান্তি ঘটাবে এবং রক্তপাত করবে?' কেননা আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত কারো প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া থেকে পবিত্র। কিন্তু তাদের জ্ঞানের পরিধি ঐ পর্যন্তই ছিল সীমাবদ্ধ, কারণ এটা তাদের জানার উপায়

ছিল না যে, ইচ্ছার স্বাধীনতা অনেক ভাল সম্ভাবনার দ্বারও খোলে দেয়, যা দ্বারা স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জীবরা ফিরিশতাদেরও উপরে নিজেদের মর্যাদাকে উন্নীত করে নিতে পারে। তদুপরি আল্লাহ্ তা'আলার সার্বিক পরিকল্পনা সম্বন্ধেও তাদের কিছু জানার ও বুঝার উপায় ছিল না। আবার পরে আদমের সাথে জ্ঞানের পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েও তারা তাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারে। তারা বুঝতে পারে, আদমের দেহ মাটির তৈরী হওয়া সত্ত্বেও তার অন্তর ছিল জ্ঞান পিপাসু। পৃথিবীর সমস্যা সঙ্কুল পরিবেশে টিকে থাকার জন্য দৈহিক উপাদানের চাইতে জ্ঞানের গুরুত্ব বেশী। ফিরিশতাদের সে রকম কোন জ্ঞান ছিল না। আর জ্ঞানের প্রতি মানুষের অসীম আগ্রহই তাকে দান করে সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব। সে হয় আশরাফুল মাখলুকাত।

মানুষের দুর্বল দিকগুলো - অর্থাৎ তারা তাঁর অবাধ্যতা ও মারামারি কাটাকাটি করবে - আল্লাহ্ তা জানতেন, কিন্তু তিনি এও জানতেন যে এদের মধ্যেই নবী-রাসূল, সত্যবাদী, শহীদ, আল্লাহ্‌ভীরু, সৎ ও আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভকারীরা জন্মলাভ করবে এবং তাঁরা যথারীতি আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে চলবে।

জ্বিনদের একটি দলের নেতা ছিল ইবলীস। মানব জাতির উচ্চ মর্যাদা অর্জনের সম্ভাবনার ব্যাপারে সে যেন একমত হতে পারল না। জ্বিনরাও মানুষের মত ইচ্ছা ও কর্মের ব্যাপারে সীমিত স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতি। তাদের সৃষ্টি হয়েছে অনেক পূর্বে, তারা আগুন থেকে তথা জ্বলন্ত বা উত্তপ্ত বায়বীয় পদার্থ থেকে সৃষ্ট। তাদের অভিজ্ঞতা বহু দিনের, তাই ইবলীস সহজেই বুঝতে পারল, কাদামাটি দিয়ে তৈরী এই নূতন মানব জাতি শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে নেহায়েত এক ঠুনকো ও দুর্বল প্রাণী। সে ভাবল, এরকম একটা নীচুমানের জীবকে সিজদা করে সম্মান দেখাতে হবে, যে-সম্মান পাওয়ার কোন যোগ্যতাই তার নেই, - এ হতেই পারে না! এভাবে ইবলীসের অহংকারই তাকে আদম (আ)-কে সম্মাণ দেখানো থেকে বিরত রাখল, - কিন্তু এ ছিল তার হঠকারিতার এবং স্বয়ং স্রষ্টার নির্দেশ পালন করতে সরাসরি অস্বীকার করার এক চরম দৃষ্টান্ত। কেননা সে লক্ষ্য করেছে আদম (আঃ) এর দৈহিক উপাদানের প্রতি, অথচ আল্লাহ্ আদম (আ)-কে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর মধ্যে স্বীয় রূহ্ ভরে দিয়েছেন।

তাফসীরকারক আব্দুল্লাহ্ ইউসুফ আলীর ভাষায় : অহংকারী যখন তার কৃত অপরাধের সাজা পাওয়ার সম্মুখীন হয় তখন সে কী করে? সে তখন আরো হঠকারী হয়ে উঠে, তদুপরি সে হয়ে উঠে মিথ্যাবাদী এবং প্রতিশোধপরায়ণ। তাই

যখন আল্লাহ্ ইবলীসকে কিয়ামাত পর্যন্ত অভিশপ্ত ও বিতাড়িত ঘোষণা করলেন, তখন সে আল্লাহ্র কাছে কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত তার কর্মের স্বাধীনতা বহাল রাখার অবকাশ প্রার্থনা করল। আর আল্লাহ্ তা'আলা যেই তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন, তখনই সে তার স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনকে সরাসরি দোষারোপ করে বসল যে, আল্লাহ্ই তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং সে কারণে এই অবকাশ পাওয়ার পুরা সময়টুকু সে মানবজাতিকে পথভ্রষ্ট করার কাজে ব্যয় করবে! (উপরের আয়াত ৭:১৬, ৭:১৭ দ্রঃ)।

এভাবে ইবলীস ও তার অনুসারী বিপথগামী জ্বিন বা শয়তানের দল আল্লাহ্ ও মানবজাতির শত্রুতে পরিণত হল। আর শুরু হয়ে গেল শয়তান তথা অশুভ ও পাপের দিকে অহ্বানকারী শক্তির বিরুদ্ধে নিস্পাপ মানব জাতির যুদ্ধ, কেননা কোন মানব শিশুই জন্মগতভাবে পাপী নয়, শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে তবে সে পাপ করতে প্রবৃত্ত হয়। আর এই পটভূমিতেই সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তা'আলার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে চলল, - তিনি পরীক্ষা করবেন তাঁর কোন্ বান্দা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে আর কে শয়তানের অনুসারী হয়। এর ফলাফল চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হবার দিনই হচ্ছে কিয়ামাতের দিন।

মানব জাতির প্রথম পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া ও তাতে অকৃতকার্য হয়ে জান্নাত থেকে বিদায় :

ইবলীস কর্তৃক মানব জাতিকে বিপথগামী করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা দেয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ) ও তাঁর সঙ্গিনীকে (যাকে তিনি আদম (আ) সৃষ্টির পরই সৃষ্টি করেছিলেন) ইবলীসের ব্যাপারে সতর্ক করে দিলেন, কেননা তাঁরা দুজন ছিলেন নিস্পাপ এবং কোন প্রকার মিথ্যাচারিতা ও চক্রান্তের বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু প্রথম পরীক্ষায় তাঁরা আপাতঃদৃষ্টে অকৃতকার্য হলেন। কুরআনের ভাষায় :

২০:১১৭। তৎপর *আমরা* বললাম, হে আদম! নিশ্চয়ই এ (শয়তান) হচ্ছে তোমার ও তোমার সঙ্গিনীর শত্রু, সুতরাং সে যেন তোমাদেরকে (কুমন্ত্রণা দিয়ে) জান্নাত থেকে বের করে না দেয়, যার ফলে তোমরা দুঃখ-কষ্টে পড়।

২০:১১৮। তোমার জন্য এখানে যথেষ্ট (সামগ্রী) আছে যাতে ক্ষুধার্ত না হও কিংবা পোশাকবিহীন না হও;

২০:১১৯। এবং পিপাসার্ত না হও অথবা রৌদ্র-ক্লিষ্টও না হও।

৭:১৯। আর হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস করতে থাকো এবং যেখানে যা ইচ্ছা হয় তা তোমরা খেতে পারো, কিন্তু এই (বিশেষ) গাছটির নিকটেও যেয়ো না, (গেলে) তবে তোমরা উভয়ে যালিম (অন্যায়কারী/পাপী)-দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

২০:১২০। কিন্তু শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বলল, হে আদম! আমি কি তোমাকে অনন্ত জীবনদানকারী এক গাছের কথা (যার ফল খেলে চিরঞ্জীব হওয়া যায়) এবং চির অক্ষয় এক রাজত্বের কথা বলে দেব?

৭:২০। তৎপর শয়তান তাদের দুজনকে (এমন) কুমন্ত্রণা দিল (যাতে) সে তাদের নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহ, যা তাদের পরস্পরের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছিল, তাদের কাছে প্রকাশ করে দিতে পারে, আর (এও) বলল, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে এই গাছ সম্বন্ধে যে নিষেধ করেছেন তা কেবল একারণেই যে, (এর ফল আস্বাদন করে) পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশতা হয়ে যাও অথবা (জান্নাতে) চিরঞ্জীব হয়ে যাও।

৭:২১। সে তাদের কাছে শপথ করে বলল, আমি অবশ্যই তোমাদের উভয়ের হিতাকাঙ্ক্ষীদেরই একজন।

৭:২২। এভাবে সে তাদেরকে প্রতারণার মাধ্যমে অধঃপতিত করল। অতঃপর যখন তারা সে গাছ (এর ফলের) আস্বাদ গ্রহণ করল, তখন তাদের লজ্জাস্থানসমূহ তাদের উভয়ের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের (গাছের) পাতা দ্বারা নিজেদের আবৃত করতে লাগল। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে ঐ গাছের কাছে যেতে নিষেধ করিনি এবং তোমাদেরকে বলিনি যে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? (অনুরূপ ২০:১২১)।

৭:২৩। (নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে) তারা দুজনে বলে উঠল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা না করো এবং আমাদেরকে দয়া না করো, তাহলে আমরা চরম ক্ষতিগ্রস্তদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

৭:২৪। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, তোমরা (জান্নাত থেকে পৃথিবীতে) নেমে

যাও, তোমরা (ও শয়তান) একে অন্যের শত্রু। পৃথিবীতে (থাকার উদ্দেশ্যে) তোমাদের জন্য সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বসবাসের জায়গা ও জীবন-সামগ্রীর ব্যবস্থা থাকবে।

৭:২৫। তিনি বললেন, সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে এবং সেখান থেকেই তোমাদের বের করে আনা হবে।

২০:১২২। তৎপর প্রতিপালক তাকে (তার বংশধরদের হিদায়াতের জন্য নবী হিসেবে) মনোনীত করলেন, (তার ক্ষমা প্রার্থনার জন্য) তার তওবা কবুল করলেন এবং তাকে সঠিক পথের নির্দেশ দিলেন।

২০:১২৩। তিনি বললেন তোমরা উভয় (পক্ষ) এখান থেকে নেমে যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। এরপর আমার তরফ থেকে তোমাদের কাছে সৎপথের নির্দেশ আসলে, যে আমার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করবে সে কখনো বিপথগামী হবে না এবং (আখিরাতে) কোন দুঃখ-কষ্টও পাবে না। (২:৩৫ থেকে ২:৩৮ অনুরূপ)

২:৩৯। আর যারা কুফরী (নির্দেশ অস্বীকার ও অমান্য) করবে এবং *আমাদের* নিদর্শনসমূহকে (অস্বীকার করতঃ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী, তারা সেখানে চিরদিন বাস করবে।

মানুষের অনুধাবনীয় এবং শিক্ষনীয় একাধিক বিষয় :

উপরের আয়াতসমূহের আক্ষরিক সারমর্ম হচ্ছে আমাদের আদি পিতা-মাতা আদম (আ) ও তাঁর সঙ্গিনী (হাওয়া) আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হয়ে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হন এবং ইতিপূর্বে অভিশপ্ত ও বিতাড়িত চিরশত্রু শয়তানদের মোকাবেলা করে পৃথিবীতে বসবাস করার জন্য তথায় প্রেরিত হন। তথাপি এই আয়াতসমূহে মানুষের অনুধাবন করার এবং শিক্ষা গ্রহণ করার একাধিক বিষয় বর্তমান।

(১) যারা খাঁটি ঈমানদার তারা কুরআনুল করীমের প্রতিটি কথায় সরাসরি অর্থাৎ কোন প্রকার যুক্তিতর্কের আশ্রয় না নিয়ে বিশ্বাস করেন। সুতরাং তারা শয়তানের প্ররোচনাদানের ক্ষমতা সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করেন না। বর্তমান যুগের মানুষের মধ্যে দুর্বল ঈমানের কোন কোন লোক ভাবতে পারেন যে, 'যাকে আমি দেখি না বা যে আমার সঙ্গে কোন যোগাযোগ স্থাপন করে না এমন অদৃশ্য

সত্তা আমাকে কেমন করে তার কুমন্ত্রণা দিয়ে প্রভাবিত করবে? আমার সিদ্ধান্ত আমিইতো নিচ্ছি এবং আমিই আমার ভাল মন্দ বুঝি'। প্রকৃত পক্ষে বিশ্বাস করার জন্য চাক্ষুষ দেখা কিংবা স্পর্শে উপলব্ধি করা কোন শর্ত নয়। বর্তমান যুগের প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষই দুরবর্তী কোন যন্ত্রকে ঘরে বসে পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যেমন করছে মহাকাশে স্থাপিত কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে শুরু করে ঘরের টিভি বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রকে (ছোট একটি রিমোট সেট দ্বারা!)। অথচ শুধু মানুষ কেন, বিশ্বের পূর্বাপর সকল মানুষ, জ্বিন ও ফিরিশতা এবং বাকী সকল প্রাণী মিলেও একটি অণু বা পরমাণুও সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। আর যিনি বিশ্বের সবকিছুর স্রষ্টা, সেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করার জন্য একটি অদৃশ্য প্রতিপক্ষ সৃষ্টি করেছেন - এটুকু বুঝতে যুক্তি খোঁজতে হবে?

প্রকৃত পক্ষে, শয়তান তথা পাপের পথে প্ররোচনাদানকারী শক্তিশালী প্রতিপক্ষের উপস্থিতিই যদি না থাকত, তা হলে মানুষের পাপ করার কোন প্রবণতাই থাকত না এবং নিষ্পাপ মানুষকে পরীক্ষা করার সুযোগও থাকত না। সে ক্ষেত্রে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোরই কোন উদ্দেশ্য থাকত না।

তবে শয়তান আগুন তথা তপ্ত বায়বীয় পদার্থ থেকে তৈরী অদৃশ্য সত্তা হওয়া সত্ত্বেও মানুষ কিংবা অন্য যে-কোন প্রাণীর আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা তার ছিল (যা শেষ উম্মাতের সময় থেকে আর নেই), ফলে অদৃশ্য অথবা দৃশ্যমান উভয় অবস্থায় সে মানুষকে প্ররোচনা দিতে পারত। কিন্তু আদম (আ)-এর সামনে সে সশরীরে উপস্থিত হয়ে, না অদৃশ্য অবস্থায় কুমন্ত্রণা দিয়েছিল তার উল্লেখ নেই এবং তা কোন বিবেচনার বিষয়ও নয়। তার কুমন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার, মানুষকে এটাই মনে রাখতে হবে এবং এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, কেননা শয়তান তার কুমন্ত্রণা সবসময়ই আকর্ষণীয় করে উপস্থিত করে থাকে এবং কুমন্ত্রণাটি যে সঠিক ও লাভজনক সে সম্পর্কে সে সবসময় আশ্বাস দেয়, আর তা পালন করাও মানুষের জন্য সহজ ব্যাপার।

(২) নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার সাথে লজ্জাস্থান প্রকাশ পাওয়ার সম্পর্ক কি, এ নিয়ে তাফসীরকারকগণের অধিকাংশই বেশী কিছু ব্যাখ্যা দিতে চাননি, তারা আক্ষরিক অনুবাদেই বিষয়টি সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এর কারণ দলিল-প্রমাণ তথা সহীহ্ হাদীসের ভিত্তি ছাড়া মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়া সমীচীন নয়। আল্লামা ইউসুফ আলী তাঁর বিখ্যাত ইংরাজী অনুবাদ ও তফসীরে লজ্জাস্থান কথাটি আদৌ

ব্যবহারই করেননি। তাঁর মতে আদম (আ) ও হাওয়া ছিলেন নিষ্পাপ, তাঁরা লজ্জা কি তা জানতেন না, কিন্তু আল্লাহ্‌র নির্দেশ ভুলে গিয়ে শয়তানের কথা শুনে পাপবৃক্ষের নিকটবর্তী হওয়ায় (এবং তার ফল খাওয়ায়) যে অবাধ্যতার পাপ করেন তাতে তাঁদের পাপহীনতার আবরণ খসে পড়ে এবং সেই পাপের লজ্জাবোধ থেকে নিজেদের আড়াল করার জন্য যা সামনে পেয়েছেন তাই অর্থাৎ বাগানের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের আবৃত করেছেন। বাংলায় প্রাপ্ত প্রায় সকল তাফসীর ও অনুবাদেই লজ্জাস্থান আবৃত করার কথা লিখা হয়েছে। তবে উৎসুক পাঠকের জন্য নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার সাথে এর সম্পর্ক কি সে ব্যাপারে কেবল কিছু অনুমাননির্ভর আলোচনা করা যেতে পারে।

জান্নাতের পরিবেশে পানাহারের সকল ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সে পরিবেশ মানুষের বংশ বিস্তারের জন্য তৈরী নয়। অর্থাৎ মানুষ যে-সকল খাদ্য খেয়ে বড় হতে থাকে এবং বংশ বিস্তারের শারীরিক উপযোগিতা প্রাপ্ত হয়, সে রকম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা জান্নাতে নেই বা থাকার কথা নয়। তাই অনুমান করা যেতে পারে যে, আদম (আ)-কে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর কোন শস্য বা ফল গাছের গুণাগুণ সম্পন্ন একটি গাছ বা বাগান সৃষ্টি করেছিলেন, যার ফল খেলে শরীরের বর্ধন প্রক্রিয়া শুরু হয়।

একটি মানব শিশু যেমন কাপড় পরিধান করা আর না করার মধ্যে কেবল ঠাণ্ডা বা গরম লাগা ছাড়া আর কিছু বুঝে না অর্থাৎ লজ্জাস্থান সম্পর্কিত লজ্জার ব্যাপারে তার কোন ধারণাই থাকে না, আদম (আ) ও হাওয়াও তেমনই এ ব্যাপারে ছিলেন অজ্ঞ, যদিও বেহেশতী বস্ত্র তাদের পরিধানে ছিল। কিন্তু নিষিদ্ধ অথচ পৃথিবীর উপযোগী শরীরবর্ধক ফল আহার করার ফলে তাদের শারীরিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন শুরু হয় এবং তাতে তাদের আদি পরিচ্ছদ (ছোট হওয়ার কারণে) শরীর থেকে খসে পড়ে। এতে একদিকে তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের কাছে প্রকাশ পেয়ে যায় এবং অপর দিকে শরীরে এর উপস্থিতি সম্পর্কে তারা নূতন অনুভূতি লাভ করেন। এতে স্বর্গীয় নিষ্কলুষ অবস্থা থেকে তারা পার্থিব প্রয়োজন ও অপরিচ্ছন্নতার সংকটে পতিত হওয়ার সম্মুখীন হন। পাপ বোধের লজ্জায় এবং বিবস্ত্র অবস্থার লজ্জায় দিশেহারা আদি মানব ও মানবী জান্নাতের লতাপাতা দিয়ে নিজেদের আবৃত করার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু পাপ থেকে মুক্তির পথ তাঁদের তখনও জানা ছিল না। তারা অত্যন্ত ভীত ও শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর অসীম রহমতে তখন তাদের ক্ষমা চাওয়ার ভাষা

শিখিয়ে দিলেন, আর তারা বললেন, 'রাব্বানা যলামনা আনফুসানা... (২:৩৭ ও ৭:২৩)।

এই অনুমানের একটি ইঙ্গিত অবশ্য ইব্‌নে কাসীরের তাফসীরে এভাবে আছে : 'ঐ গাছের ফল খেলে মানবীয় প্রয়োজন দেখা দিত (প্রস্রাব, পায়খানা) এবং ওটা বেহেশ্‌তের যোগ্য নয়। আল্লাহ্‌ই সব ব্যাপারে জ্ঞাত।'

(৩) মানুষের প্রথম পরীক্ষার সার্বিক ফলাফল ঃ আপাতঃদৃষ্টে মানুষ প্রথম পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষ জাতি যে অন্যান্য জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে তা প্রমাণিত হয়ে যায় এই পরীক্ষায়। স্বেচ্ছায় অপরাধ করে ধরা পড়ে যখন শয়তান অভিশপ্ত হয়, তখন সে আরো হঠকারী হয়ে যায় এবং স্বয়ং স্রষ্টাকে তার দুর্ভাগ্যের জন্য দোষারোপ করে, অথচ আদম (আ) অপরাধ করেন প্ররোচনায় পড়ে এবং তার পরই অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি তো এমন কথা বলেননি যে, 'আল্লাহ্‌ আমার কাছে নিষিদ্ধ ফল না রাখলে আমি তো তা খেতাম না'। স্রষ্টার কাছে শর্তহীন ক্ষমা চাওয়াই সাফল্যের পথ এবং এখানেই আদমের শ্রেষ্ঠত্ব আরও এক বার প্রমাণিত হয়ে যায়।

(৪) শিক্ষণীয় বিষয় ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলার পরিকল্পনাই ছিল যে, তিনি আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে তাকে পৃথিবীতে আশরাফুল মাখলুকাত বা শ্রেষ্ঠ জীব ও প্রতিনিধি হিসেবে পাঠাবেন। তাহলে তাকে সরাসরি না পাঠিয়ে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা কেন? এর কারণ, মানুষ আর বলতে পারবে না যে, তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা জোর করে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে। কেননা তাকে ভাল ও মন্দ বাছাইয়ের এবং আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ মান্য করা বা না করার স্বাধীনতা দিয়ে তৈরী করা হয়েছে এবং তাকে নিষিদ্ধ ফল না খেয়ে জান্নাতে চিরদিন সুখে থাকার স্বাধীনতাও দেয়া হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র নির্দেশ ভুলে যাবার কারণেই জান্নাতে থাকার সুযোগ তার হাত ছাড়া হয়েছে, অর্থাৎ ভুল তার নিজেরই। এ থেকে আদম জাতি যে প্রকৃত শিক্ষা পেল তা হল, আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করা এবং না করার পরিণতি কি। এভাবে কিয়ামাতের দিনও তারা তাদের এজগতের কৃতকর্মের জন্য কোন প্রকার অজুহাত দেখাতে পারবে না, কেননা সৎপথে চলার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা সকল যুগে সকল জাতির কাছে তাঁর নবী পাঠিয়েছেন তাদেরকে হিদায়াত করতে, আর তিনি তাঁর অসীম ক্ষমার দ্বার সর্বদা খোলা রেখেছেন আদম সন্তানের জন্য, যাতে আদম (আ) যেভাবে ক্ষমা চেয়েছিলেন সেভাবে তারাও ভুল করে ফেললে বা

অবাধ্য হয়ে গেলে এবং তারপর অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইলে তিনি তাদের দিকে ফিরে তাকাবেন।

মানুষ আরো জানতে পারলো যে, তারা মনের দিক থেকে বড় দুর্বল জাতি, তারা সহজেই প্ররোচিত হয়, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা না করে মানুষ হুট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। এসব কারণেই তাদের অধিকাংশই আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃতজ্ঞ।

১.৩। মানব সত্তার দুর্বল দিকসমূহ

আল্লাহ্ তা'আলা আদি মানব আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন কাদামাটি থেকে এবং হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন আদম (আ)-এর পাজর থেকে (কুরআন-৩৯:৬)। অর্থাৎ উভয়ই মূলতঃ সরাসরি মাটির উপাদান থেকে তৈরী। তৎপর বাকী আদম সন্তানকে তিনি সৃষ্টি করেছেন 'তুচ্ছ একটি তরল পদার্থের নির্যাস থেকে' (কুরআন ৩০:২০, ৩২:৮, ৮০:১৮-১৯, ৮৬:৬-৭ ইত্যাদি), যা প্রতিস্থাপিত হয় মাতৃগর্ভে। মানুষের জন্মের উৎস তাই গর্বের কিছু নয় - অন্ততঃ ইবলীস সে সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল এবং ইবলীসের গর্ব করার কারণও ছিল; কেননা সে তৈরী হয়েছিল জ্বলন্ত ও উত্তপ্ত বায়বীয় পদার্থ থেকে (যা শক্তি বা আলো বিকীরণ করতে সক্ষম)।

মাটির উপাদান থেকে সৃষ্ট হলেও আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে তাঁর সুন্দরতম আকৃতির সৃষ্টি হিসেবে তৈরী করেছেন। কুরআনের একাধিক আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে। যেমনঃ ৯৫:৪। *আমরা* তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে। (অনুরূপ ৮২:৭ - ৮২:৮)।

কিন্তু মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার দৈহিক উপাদানে সীমাবদ্ধ নয়, কারণ সেই মাটির দেহে আল্লাহ্ স্বয়ং রূহ্ ফুঁকে দেন এবং এর ফলে মানুষ জ্ঞান আহরণ ও ভাল-মন্দ বুঝার ক্ষমতা ও কাজের স্বাধীনতা লাভ করে। এই স্বাধীনতার জন্য তার উপর জবাবদিহিতার দায়িত্ব চলে আসে। আবার এই স্বাধীনতাই তার সত্তার দুর্বল দিকগুলোও উন্মোচিত করে দেয়। মানুষের দুর্বল দিকগুলোকেই শয়তান নিজের উদ্দেশ্য সাধনে সুযোগমত কাজে লাগায়।

মানুষ তাড়াহুড়া প্রিয়, ধৈর্য ও চিন্তা ব্যতীত সিদ্ধান্ত নিতে চায়

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

১৭:১১। মানুষ (না বুঝে) অমঙ্গলের কামনা (সেভাবেই) করে, যেভাবে সে

মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করে থাকে; বস্তুতঃ মানুষ (কাঙ্ক্ষিত বস্তুর জন্য) অতিমাত্রায় তাড়াহুড়া প্রিয়। (যেমন অল্পতেই অন্যকে অভিশাপ দেয়া)।

২১:৩৭। মানুষ তাড়াহুড়ার প্রবণতা নিয়ে সৃষ্ট; শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখিয়ে দেবো, অতএব তোমরা আমাকে (তা দেখাতে) ত্বরা করতে বলো না।

৭০:১৯। (আসলে) মানুষ সৃষ্টই হয়েছে এক অতি অস্থিরচিত্ত সত্তা হিসেবে,

৭০:২০। যখন তাকে বিপদ স্পর্শ করে তখন সে হয়ে উঠে হা-হুতাশকারী,

৭০:২১। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হয়ে উঠে অতি কৃপণ।

৩৩:৭২। *আমরা* তো (শরী'আর বিধান তথা কুরআন এর) এই আমানতকে আসমান, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি পেশ করেছিলাম, (কিন্তু) তারা তা (এর দায়িত্বভার) বহন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল, (কারণ) তারা তাতে ভীত হয়ে গেল; আর মানুষই তা (দায়িত্বটি) বহন করে নিল। সে বাস্তবিকই একান্ত যালিম (নিজের প্রতি অবিচারকারী) এবং (এই দায়িত্ব বহনের পরিণাম সম্পর্কে) নিতান্তই অজ্ঞ!

মানুষ এক অকৃতজ্ঞ প্রাণী

১১:৯। যদি *আমরা* মানুষকে *আমাদের* তরফ থেকে রহমতের (অনুগ্রহের) স্বাদ আস্বাদন করাই এবং তারপর তার কাছ থেকে তা প্রত্যাহার করি, তখন (দেখা যায়) সে হতাশাগ্রস্ত ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

১১:১০। আর যদি দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর *আমরা* তাকে অনুগ্রহের (সুখ-শান্তির) আস্বাদন করাই, তখন সে অবশ্যই বলতে শুরু করে, আমার বিপদ-আপদ কেটে গেছে; - সে (সত্বরই) উৎফুল্ল ও (ততোধিক) গর্বিত হয়ে উঠে!

১১:১১। কেবল ধৈর্যধারণকারী ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা ব্যতীত (তারা তা করে না), এরাই হচ্ছে সে-সব লোক যাদের জন্য রয়েছে (আল্লাহ্‌র তরফ থেকে) ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

৮৯:১৫। মানুষ এমনই (এক প্রাণী) যে, তার প্রতিপালক যখন তাকে সম্মান ও অনুগ্রহ (সম্পদ) দিয়ে পরীক্ষা করেন তখন সে (গর্বভরে) বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন।

৮৯:১৬। আবার যখন তিনি তার জীবিকা সংকীর্ণ করে তাকে পরীক্ষা করেন, তখন সে বলে উঠে, আমার প্রতিপালক আমাকে অপদস্থ করেছেন!

৩৯:৪৯। মানুষকে বিপদাপদ স্পর্শ করলে সে *আমাদেরকে* (সাহায্যের জন্য) ডাকতে থাকে, তার পর যখন *আমাদের* তরফ থেকে তাকে *আমরা* কোন নিয়ামাত দ্বারা অনুগ্রহ করি তখন সে বলে উঠে, আমাকে এ (নিয়ামাত) তো দেয়া হয়েছে আমার (বিশেষ) জ্ঞান থাকার কারণে! বস্তুতঃ এটা এক পরীক্ষা মাত্র, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা বুঝে না।

অতিরিক্ত অনুরূপ আয়াত : ১০:১১, ১০:১২, ১০:২১ - ১০:২৩, ১৭:৬৭ - ১৭:৬৯, ২২:১১, ৩০:৩৩, ৩০:৩৪, ৩৯:৮, ৪১:৪৯ - ৪১:৫১ ইত্যাদি।

মানুষ ইহজাগতিক সম্পদের প্রতি অতি লোভী

অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান মানুষের জন্য অপরিহার্য। এছাড়াও মানুষের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের জন্য শিক্ষা এবং নির্দোষ খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদ প্রয়োজন। এসবের জন্য প্রয়োজন অর্থ। আর সৎপথে অর্থ উপার্জন ইবাদাতের অঙ্গ। কিন্তু কতটুকু অর্থ বা সম্পদ মানুষের জন্য অপরিহার্য, এর সীমা নির্ধারণে মানুষ চিরকাল ব্যর্থ হয়েছে, অর্থাৎ যত বেশী সম্পদ সে জড় করেছে ততই তার সম্পদের চাহিদা ও লোভ বেড়ে গেছে। বেশীর ভাগ মানুষ তাই ইহজগতের সম্পদ, কর্তৃত্ব ও পদমর্যাদার পিছনে যে পরিমাণ শ্রম ও সময় ব্যয় করে, সে তুলনায় তারা পরকালের প্রস্তুতিতে তেমন কোন সময় দিতে চায় না, বরং দেখা গেছে ইহজগতের মোহে অধিক অর্জনের লক্ষ্যে এ সকল মানুষ একদিকে অসৎ পন্থা অবলম্বন করেছে, অপর দিকে দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

২:২১২। যারা (আল্লাহ্ তা'আলাকে) অস্বীকার করে তাদের জন্য পার্থিব জীবনকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে রাখা হয়েছে, আর এরা ঈমানদারগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে থাকে। আর যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে তারা কিয়ামাতের দিন এদের উপরে মর্যাদাবান থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিয্ক দান করেন।

৩:১৪। মানুষের নিকট সুন্দর ও লোভনীয় করে রাখা হয়েছে নারি জাতি, সন্তান-

সন্ততি, রাশিকৃত সোনা-রূপা আর (উত্তম জাতের) চিহ্নিত ঘোড়া (বাহন), গবাদি পশু এবং (উর্বর) ক্ষেত-খামার। এসব হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগের সামগ্রী (মাত্র)। কিন্তু উৎকৃষ্টতম আশ্রয়স্থল রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলারই নিকট। [অনুরূপ : ৬:৩২, ১৮:৪৬, ২৮:৬০, ২৯:৬৪]

১৪:৩। (অবিশ্বাসীরা) যারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চেয়ে বেশী ভালবাসে ও (মানুষকে) আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করে রাখে এবং সে-পথের (মধ্যে দোষণীয় জিনিষ অনুসন্ধান করতঃ তাতে) বক্রতা তৈরী করতে চায়, তারাই ঘোর বিভ্রান্তিতে আছে।

১১:১৫। যদি কেউ (শুধু) পার্থিব জীবন ও তার জাঁকজমক কামনা করে, তা হলে তাদের কর্মের প্রতিফল *আমরা* এ পৃথিবীতেই পূর্ণভাবে প্রদান করি এবং সেখানে তাদের (পাওনা অংশের) কিছুই কম দেয়া হবে না।

১১:১৬। এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের জন্য পরকালে (জাহান্নামের) আগুন ব্যতীত আর কিছুই নেই; আর (পৃথিবীতে) তারা যা কিছু বানায় তা সবকিছুই হবে নিষ্ফল এবং যা কিছুই পৃথিবীতে করে তা সবই নিরর্থক।

৩৫:৫। হে মানব জাতি! নিশ্চয় (পরকাল সম্পর্কিত) আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে, আর প্রধান প্রতারকও (শয়তান) যেন কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রতারণায় না ফেলে। (অনুরূপ আয়াত : ৩:১৪৫, ৫:১০০, ১৭:১৮, ১৭:১৯, ৪২:২০ ইত্যাদি)

অথচ এই প্রধান প্রতারকের প্ররোচনা ও পার্থিব জীবনের মোহে পতিত হয়ে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই তাদের আপন স্রষ্টাকে অস্বীকার করে, তাদের এক বিরাট অংশ আবার নিজের হাতে গড়া মাটির মূর্তিকে স্রষ্টার আসনে বসিয়ে তার উপাসনা করে, আর অতীতে কেউ কেউ তো স্রষ্টার অনুগ্রহে পাওয়া ক্ষমতার গর্বে নিজেদেরকেই স্রষ্টা বলে দাবী করেছে! এর মুখ্য কারণ, এ জগতকে পরকালের প্রস্তুতিপর্ব না ভেবে মানুষ এ জগতকেই জীবনের একমাত্র ও চূড়ান্ত অধ্যায় মনে করে। যে অল্প সংখ্যক মানুষ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্বে বিশ্বাসী তাদেরও অধিকাংশই আল্লাহ্‌র আদেশ-নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করে না। ইবলীস মানুষের এ-অবস্থা সম্পর্কে ঠিকই আন্দাজ করতে পেরেছিল, অথচ মানুষ ইবলীসের বিরুদ্ধে যথার্থ প্রতিরোধ গড়তে ব্যর্থ হল!

১.৪। রিসালাত এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত নবী-রাসূল তথা তাঁর মনোনীত বার্তাবাহক বান্দাগণ কর্তৃক মানুষকে হিদায়াত করার দায়িত্ব পালনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার বিষয়টিকে রিসালাত বলা হয়।

রাসূল পাঠানোর কারণ ও প্রয়োজনীয়তা :

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে মানবজাতির দুর্বলতার দিকগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এবং তারও পূর্বের অনুচ্ছেদে এও দেখা গেছে প্রথম আদি মানব কিভাবে অতি সহজেই ধোকায় পতিত হয়ে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হন। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের যোগ্যতা ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে তার অবস্থান অত্যন্ত নাজুক, কেননা শয়তানের কাছে মানব জাতির সকল দুর্বলতা প্রকাশিত হয়ে আছে এবং সে সর্বদাই তার দলবল নিয়ে মানুষকে কুমন্ত্রণা দিতে ওঁৎ পেতে থাকে, অথচ মানুষ তাকে দেখতে পায় না। (--- সে নিজে ও তার দল তোমাদিগকে এমনভাবে দেখে যে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না --- ৭:২৭)।

মানুষের এই অসুবিধাজনক ও নাজুক অবস্থানই তার জন্য সরল পথে চলতে পারা প্রায় অসম্ভব করে দিয়েছে, আর এটাই তার জন্য পথ প্রদর্শকের উপস্থিতি অনিবার্য করে তুলেছে। এ কারণেই িিআল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে,

২০:১২৩। '..... এর পর আমার তরফ থেকে তোমাদের কাছে সৎপথের নির্দেশ আসলে যে আমার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করবে সে কখনো বিপথগামী হবে না এবং কোন দুঃখকষ্টও পাবে না.....।' (২:৩৮ ও অনুরূপ)।

এই আশ্বাস দান ও বাস্তবে মানুষের বার বার বিপথগামী হওয়ার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা যুগে যুগে মানুষের কাছে তাঁর রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন, যেন মানুষ সৎপথে ফিরে আসে। কেননা এটা দেখা গেছে যে, অতীতের নবীগণের পরলোক গমনের কিছু কাল পরই তাঁদের অনুসারীরা আবার শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়ে শিরক্-এ তথা দেব-দেবীর পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে এবং সমাজে অন্যায় ও অরাজকতা সৃষ্টি করেছে। রাসূলগণের মধ্যে উচ্চতর মর্যাদাসম্পন্ন ও দায়িত্বপ্রাপ্তরা আল্লাহ্‌র কিতাবসহ এসেছেন এবং বাকীরা কেবল আল্লাহ্‌র বিশেষ নির্দেশাবলী মৌখিকভাবে প্রচার করেছেন। সকল নবী-রাসূলের

আনীত মূল বার্তা ছিল একই, - মানুষ যেন আল্লাহ্‌কে তাদের একমাত্র উপাস্য বলে মেনে নেয় এবং নবীর ঘোষিত সৎ ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

২১:২৫। (হে রাসূল!) আমি আপনার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি এই ওহী ব্যতীত যে, 'আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ (মাবুদ) নেই', সুতরাং কেবল আমারই ইবাদাত করো।

নবী-রাসূলগণের আগমনের ধারাবাহিকতায় শেষ নবী ও রাসূল হচ্ছেন মুহাম্মদ (সা)। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল কারীমে নবীদের সম্পর্কে বলেন :

২:২১৩। (এক সময়) সকল মানুষ একই উম্মাহ্‌র (আদর্শের অনুসারীদের) অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে (তারা বিভক্ত ও বিপথগামী হয়ে যাওয়ায়) আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে (আল্লাহ্‌র রহমতের) সুসংবাদদাতা ও (পাপিদের শাস্তির) সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন। আর তাদের সাথে তিনি সত্য (জ্ঞান ও নির্দেশনা) সহ কিতাবও পাঠালেন, যাতে মানুষেরা যেসব বিষয়ে পারস্পরিক মতভেদ করত সেসব বিষয়ের তারা মীমাংসা করে দিতে পারেন। কিন্তু যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল (আহ্‌লে কিতাব, তথা ইহুদী ও খৃষ্টান) তারা তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও কেবল পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ সেসব বিষয়ে বিরোধিতা করত। তারা যেসব বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করত আল্লাহ্ তা'আলা সেসব বিষয়ে ঈমানদারগণকে নিজ অনুগ্রহে সৎপথে পরিচালিত করেন। (কেননা) আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

৪:১৬৩। (হে মুহাম্মদ!) নিশ্চয় *আমরা* আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি, যেভাবে *আমরা* ওহী প্রেরণ করেছিলাম নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি। *আমরা* ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তার বংশধরগণ এবং ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারুন ও সুলাইমানের নিকটও ওহী প্রেরণ করেছিলাম; আর দাউদকে দিয়েছিলাম যাবুর গ্রন্থ।

৪:১৬৪। (প্রেরিত) অনেক রাসূলের কথা *আমরা* তোমাকে ইতিপূর্বে বলেছি, এবং (তাদের মধ্যকার) অনেক রাসূলের কথা তোমাকে বলিনি, আর মূসার সাথে আল্লাহ্ সাক্ষাৎ কথা বলেছেন।

৪:১৬৫। রাসূলগণ এসেছিলেন (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা এবং (জাহান্নামের) সাবধানকারীরূপে, যাতে রাসূলগণের (আসার) পর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মানুষের

কোন অভিযোগ (করার সুযোগ বা অজুহাত) না থাকে। অবশ্যই আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

১০:৪৭। আর প্রত্যেক উম্মাতের জন্য একজন রাসূল রয়েছে, যখন তাদের রাসূল এসে যায়, (তখন) তাদের বিষয় ন্যায়বিচারের সাথে মীমাংসা করা হয় এবং তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হয় না। (অনুরূপ আয়াত - ১৬:৩৬, অনুচ্ছেদ ২.১)

কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ছাব্বিশজন নবীর নাম উল্লেখ করেছেন এবং আরো কিছু নবীর নাম উল্লেখ না করে কেবল 'প্রেরিত ব্যক্তি' রূপে বর্ণনা করেছেন। রাসূলগণ প্রত্যেকেই তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব, যা মূলত আল্লাহ্র একত্ববাদ ঘোষণা ও আল্লাহ্র প্রতি অনুগত থাকার আহ্বান, পালন করে গেছেন। শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) ব্যতীত বাকী সকল নবীই তাঁদের নিজস্ব কওম ও জনপদের নবী বা পথ প্রদর্শক হিসেবে প্রেরিত হন, শেষ নবী (সা) পৃথিবীর সকল মানুষের পথ প্রদর্শক হিসেবে এসেছিলেন। পৃথিবীতে কতজন নবী এসেছিলেন এর নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য নেই, তবে তাঁদের সংখ্যা বহু সহস্র থেকে লক্ষাধিক বলে অনুমান করা হয়।

কুরআনে বর্ণিত পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে অর্ধেকের মত নবীর সংগ্রামী জীবনের কার্যকলাপ মোটামোটি বিস্তারিত থেকে অতি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, বাকী নবীগণের সম্পর্কে কেবল 'আল্লাহ্র বিশ্বস্ত বান্দা' - এই ধরসের উল্লেখ বা তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি (কওম এর নাম) ও জীবনের কোন একটি ঘটনা ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। এই শেষোক্ত দলে আছেন :

১। আদম, ২। ইদ্রিস, ৩। ইসমাঈল, ৪। ইসহাক, ৫। ইয়া'কুব, ৬। ইউনূস, ৭। ইলিয়াস, ৮। হারুন, ৯। উযাইর, ১০। আইয়ুব, ১১। যুল-কিফ্ল, ১২। ইয়া-সা-আ ও ১৩। ইয়াহ্ইয়া (আলাইহিমুস্সালাম)।

পূর্ববর্তীকালের নবীগণের মধ্যে নবী নূহ, হূদ, সালিহ, লূত ও শোয়াইব (আলাইহিমুসসালাম) - এই পাঁচ নবীর অনুসারীরা এতই বিপথগামী, পাপাসক্ত ও আল্লাহ্-বিরোধী হয়েছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নবীদের মাধ্যমে তাদেরকে অনেক সতর্ক ও সময় দান করা সত্ত্বেও তারা সৎপথে ফিরে আসেনি, ফলে তিনি তাদের সমগ্র জাতিকে তাদের জনপদসহ সম্পূর্ণ ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দেন। কেবল নবীগণ ও তাঁদের অনুসারী বিশ্বস্ত ঈমানদারগণ আল্লাহ্র এসব গজব ও অভিশাপ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।

অতীতের নবীগণের মধ্যে কুরআনুল করীমে সব চাইতে বেশী আলোচিত ও ঘটনাবহুল জীবনের অধিকারী নবী হচ্ছেন মূসা (আ) এবং তাঁর পরই বেশী আলোচিত হচ্ছেন ইব্রাহীম, ইউসুফ, দাউদ, সুলাইমান, যাকারীয়া ও ঈসা (আলাইহিমুস্‌সালাম)।

নবীগণের পৃথিবীতে আগমনের সময় :

মহাকালের কোন্‌ শুভলগ্নে প্রথম মানব-মানবী এ পৃথিবীতে এসেছিলেন এ সম্পর্কে, কিংবা নবীগণের কে কোন্‌ সময়ে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন এ সম্পর্কিত তথ্য তথা তাঁদের সময়কাল নিয়ে কুরআন কোন ইঙ্গিত দেয়নি, যদিও মূসা আ (খৃঃ পূঃ ১৬ থেকে ১৩ শতকের মধ্যবর্তী সময়) এর সময় থেকে পরবর্তী নবীগণের সময়কাল সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা যায়। তবে কোন বিশেষ মানুষ বা নবীর আগমনের সময় কাল সম্পর্কিত জ্ঞান আমাদের জন্য অবান্তর অর্থাৎ আমাদের বাস্তব ও নৈতিক জীবনে সে বিষয়ের জ্ঞানের কোন প্রভাব বা উপকারিতা নেই। নবীগণের জীবন সংগ্রামের যেসব ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি তা-ই কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেছেন।

শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) এর মাধ্যমে প্রেরিত শরী'আ :

মানব জাতির জন্য দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপ একটি সম্পূর্ণ দলিলরূপে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে নাযিল হয় কুরআনের মাধ্যমে। কুরআনে মানুষের ইহ-পরকালের প্রকৃত সাফল্যের জন্য যা-কিছু জানা ও করা প্রয়োজন তার সবকিছুরই স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা আছে। সেই দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী করণীয় কাজসমূহ কিভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং বাস্তব প্রয়োগ ও কর্মপন্থা রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং দেখিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁকে অনুসরণ করতে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। তাই কুরআন ও হাদীস (রাসূলুল্লাহ্‌র কর্মপন্থা, বাণী ও তাঁর সমর্থিত কার্যাবলী) উভয়ই ইসলামের আইন-কানুনের মৌলিক উৎস।

মানব জাতি জানে যে তারা আশরাফুল মাখলুকাত, তারা সৃষ্ট হয়েছে পৃথিবীর অন্য সকল সৃষ্ট জীবের উপর আধিপত্য নিয়ে, তাদেরকেই আল্লাহ্ মনোনীত

করেছেন এই পৃথিবীতে খলীফা বা প্রতিনিধিরূপে। তাই তারা গর্বিতও বটে। তথাপি, এত নবী-রাসূল ও আউলিয়াগণকে তাদের জন্য পাঠানো এবং শয়তান সম্পর্কে এত সতর্ক করা সত্ত্বেও, তাদের ইতিহাসের বেশীর ভাগ অংশই হচ্ছে আল্লাহ্‌র নাফরমানী, অকৃতজ্ঞতা ও ফ্যাসাদ সৃষ্টির ইতিহাস! পরকাল সম্পর্কে তাদেরকে তাই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল কারিমে শেষ বারের মত সতর্ক করে দিচ্ছেন, যাতে এরপর আর মানবজাতির কোন অজুহাতই না থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কিয়ামাতের প্রথম পর্ব ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি

২.১। কিয়ামাত কি এবং কেন?

কিয়ামাত কি?

কিয়ামাত পরকালের অনন্ত জীবনের সূচনা পর্ব। প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, অর্থাৎ বর্তমান জগতের 'জীবন্ত' অবস্থা থেকে প্রত্যেককে একদিন 'মৃত্যু' বরণ করতে হবে, এ থেকে কারো নিস্তার নেই। পরকালে বিচারের দিন মানব জাতির প্রত্যেকে নিজেদের দেহ ও প্রাণ ফেরৎপ্রাপ্ত হয়ে স্রষ্টার সম্মুখে 'কিয়াম' তথা দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকবে এবং নিজেদের ইহকালীন কৃতকর্মের জওয়াব দেবে। পাপ ও পুণ্যের সকল হিসাব শেষে আল্লাহ্‌র সুবিচারে যারা দোষী সাব্যস্ত হবে তারা হবে জ্বলন্ত আগুনের (জাহান্নামের) অধিবাসী, আর পুণ্যবানরা জান্নাতের অধিবাসী হয়ে অনন্তকাল আল্লাহ্‌র অসীম নিয়ামাতরাজি উপভোগ করতে থাকবে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ছাড়া কেউই জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ পাবে না। কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকরা হবে জাহান্নামের চির অধিবাসী, আর পাপের পাল্লা ভারী হওয়া ঈমানদার জাহান্নামবাসীদের যারা নির্ধারিত শাস্তির পর মুক্তি পাবে, তারাও কেবল আল্লাহ্ তা'আলার অসীম অনুগ্রহের কারণেই পাবে।

পরকাল সম্পর্কিত উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কোন অনুমাননির্ভর বক্তব্য নয়। আল্লাহ্‌র বাণী কুরআনের অসংখ্য আয়াতে কিয়ামাতে মানুষের পুনরুত্থান, বিচার এবং জাহান্নামের সাবধানবাণী ও জান্নাতের সুসংবাদ সম্পর্কিত তথ্যাদি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে (পরের অনুচ্ছেদসমূহে দ্রষ্টব্য)। আহ্‌লে কিতাবীদের (খৃষ্টান ও ইয়াহুদী) কাছে নাযিল হওয়া কিতাবদ্বয় যথাক্রমে ইঞ্জীল ও তৌরাতেও পরকালে মানুষের পুনরুত্থান ও বিচারের বিষয় উল্লিখিত আছে, যদিও কুরআনের মত এত বিশদভাবে নয় এবং ঐ দুই গ্রন্থের মূল পাঠ্য এখন অবিকৃতও নেই।

তথাপি মুসলমান ছাড়া কেবল এই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছেই পরকাল সম্পর্কিত একটি স্পষ্ট ধারণা এবং তার উৎস বর্তমান।

বিশ্বের আর বাদ বাকী সম্প্রদায়ের মানুষের কারো কাছে পরকালের প্রামাণ্য তথ্য নেই এবং তারা প্রকৃতপক্ষে এ সম্পর্কে অজ্ঞ। হিন্দুদের মধ্যে মহা প্রলয় ও স্বর্গ-নরকের ধারণা আছে বটে, কিন্তু কিয়ামাত নামক নির্দিষ্ট পর্বে মানুষ আপন পরিচয়ে পুনরুত্থিত হয়ে বিচারের সম্মুখীন হবে এবং পরবর্তী পর্বে অনন্তকাল আপন কর্মফল ভোগ করবে- এ ধারণায় তারা আদৌ বিশ্বাসী নয়। পৌত্তলিক হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস হচ্ছে, মৃত্যুর পর মানুষ আরেকটি মানুষ কিংবা পশু-পাখি অথবা কীট পতঙ্গ হয়ে, পুনর্জন্মলাভ করবে। সে কোন্ প্রাণী হয়ে পুনর্জন্মলাভ করবে তা নির্ভর করে তার পূর্ব জন্মের ভাল বা মন্দ কাজের উপর। নাস্তিক বৌদ্ধরা হিন্দুদের এই বিশ্বাসকেই প্রায় হুবহু অনুসরণ করে। পৃথিবীর অন্যান্য সম্প্রদায় বা উপজাতিদের মধ্যেও পরকাল সম্পর্কিত কোন বিশ্বাস বা ধারণা নেই। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সকল জাতির নিকট তাঁর বার্তা বাহক নবীদের মাধ্যমে ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কিত জ্ঞান ও আল্লাহ্র একত্বের বাণী প্রেরণ করা সত্ত্বেও কালক্রমে তাদের অধিকাংশই বিপথগামী হয়ে পরকালের কথা ভুলে গেছে। আল্লাহ্ বলেন,

১৬:৩৬। *আমরা* অবশ্যই প্রত্যেক জাতির প্রতি রাসূল প্রেরণ করেছি যাতে সে তাদের কাছে নির্দেশ দেয় যে, তোমরা এক আল্লাহ্র ইবাদাত করো এবং তাগুত (আল্লাহ্র নাফরমান শক্তিসমূহ্ ও বিভ্রান্তির উপকরণ)-কে বর্জন করো। অতঃপর তাদের মধ্যকার কিছু লোককে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন, আর তাদের কতেক লোকের উপর পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। অতএব তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং দেখো যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে (অস্বীকার করেছে) তাদের পরিণাম কী হয়েছে।

তাই কুরআনই মানবজাতির জন্য একমাত্র ভরসা, কুরআন (ও হাদীস) ছাড়া পরকাল সম্পর্কে কোন রকম সঠিক ধারণা করা মানবজাতির জন্য অসম্ভব। আর কুরআনে পরকালের যা জ্ঞান মানুষকে দেয়া হয়েছে তার বাইরেও মানুষের কিছু জানা বা বুঝার উপায় নেই।

খাঁটি ঈমানদারগণ কুরআনে বর্ণিত প্রত্যেক কথা অমোঘ সত্য হিসেবে বিনা প্রশ্নে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন। সমস্যা হচ্ছে মুসলমান হয়েও যারা ইহজগতের মোহগ্রস্ত হয়ে পরকাল সম্পর্কে ভুলে থাকে তাদেরকে নিয়ে। তাদের ঈমান দুর্বল

হয়ে যাওয়ার কারণে তারা কিয়ামাতের সত্যতা এবং এর তাৎপর্য নিয়ে সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ে। কুরআন পাঠ ও তা বুঝার চেষ্টা না করে এসব বস্তুবাদী ও যুক্তিবাদী লোক এবং তথাকথিত প্রগতিবাদী আঁতেলরা নিজেদের মনগড়া যুক্তি খাড়া করে মানুষকে সহজে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পায়। যারা বিভ্রান্তির পথ অনুসরণ করে অথবা যাদের সে পথ অনুসরণ করার সম্ভাবনা আছে তাদের জন্যই 'কিয়ামাত কেন?' এরকম একটি প্রশ্নের কিছু যুক্তি নির্ভর আলোচনা তাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে সহায়ক হবে।

কিয়ামাত ও বিচার কেন?

মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রেরিত খলীফা হয়ে এসেছে তাদের নিজেদের কোন দক্ষতা বা পুণ্যার্জনের কারণে নয়, বরং আল্লাহ্ তা'আলার অসীম অনুগ্রহের কারণে। মানুষ খিলাফাত কেবল এই উদ্দেশ্যেই পেয়েছে যে তারা এখানে আল্লাহ্র দাসত্ব করবে অর্থাৎ কেবল তাঁকেই একমাত্র উপাস্য ও প্রতিপালক হিসেবে স্বীকার করবে, তাঁর দেয়া নিয়মনীতি মেনে চলবে এবং পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবে। এই কর্তব্য পালনে পর্যায়ক্রমে পরবর্তীরা তাদের পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ধারাই হচ্ছে পৃথিবীতে তাদের খিলাফাত প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু মানুষ যদি তা না করে তাহলে পৃথিবীর অসংখ্য নিয়ামাতরাজির সকল সুবিধা উপভোগ ও সবকিছুর উপর 'কর্তৃত্ব' এবং আপন কর্মের স্বাধীনতা পাওয়ার বিপরীতে মানুষের কি কখনো কোন জবাবদিহিতা থাকবে না? কিংবা এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর সীমিত সম্পদ নিয়ে এখানে মানব জাতির অনন্তকাল ধরে বংশবিস্তার করে বেঁচে থাকার প্রক্রিয়া চলতে থাকবে আর এর কোন শেষ থাকবে না?

এ জগতে মানব সমাজে চিরকাল ধরে বহু ধরনের অসাম্য ও বিভেদ চলে আসছে যার সুরাহা বা সমাধান কারো কাছে নেই। সমাজে কেউ ঈমানদার, কেউ কাফির; কেউ ধনে-জনে ও মর্যাদায় উচ্চাসীন, কেউ দীন-হীন ও অবহেলিত; কেউ অত্যাচারী-অবিচারী শাসক ও শোষক, বাকীরা সব শাসিত, শোষিত ও উৎপীড়িত; কেউ ন্যায়পরায়ণ ও সংগ্রামী, কেউ অন্যায়কারী বা কর্তব্যবিমুখ দুষ্কৃতিকারী, কেউ খুনী আবার কেউ শহীদ। মানুষের মধ্যে এই যে ভাল ও মন্দ বা পাপ ও পুণ্যের অসম অবস্থা বিরাজ করে তার একটি চূড়ান্ত পাওয়া-না-

পাওয়ার বা ন্যায়বিচারের যথার্থ সমীকরণের আদৌ কোন সম্ভাবনা যদি না থাকে তবে এ জগতে তার মানুষ হয়ে বাঁচার সার্থকতা কোথায়?

এজগতের বিচারালয়ে মানুষের কিছু কিছু অপরাধের বিচার হয়, কিন্তু মানুষের সৎকর্মের তথা পুণ্যের প্রতিদান বা পুরস্কার কেউ দিতে পারে? কিংবা কারো সৎকর্মের পরিমাপ কেউ করতে পারে? অপরদিকে অপরাধের সঠিক বিচারের নিশ্চয়তাও এজগতে নেই, কেননা যাদের উপর অপরাধীর অপরাধ প্রমাণের দায়িত্ব থাকে তাদের ক্ষমতার যেমন সীমাবদ্ধতা থাকে তেমনি তাদের সততাও সর্বদা প্রশ্নের সম্মুখীন। আর অপরাধীর দোষ সঠিক প্রমাণিত হলেও প্রকৃত পক্ষে এজগতে ন্যায় বিচার সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা মানুষের নেই। কারণ, দুজন খুনীর একজন যদি মাত্র একটি খুন করে থাকে এবং অপরজন যদি দশটি খুন করে থাকে তাহলে প্রকৃত ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হত যদি দ্বিতীয় জনকে দশটি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেত। কিন্তু মানুষ মৃত্যুদণ্ড মাত্র একবারই কার্যকর করতে পারে! মানুষ কি তাহলে প্রকৃত সুবিচারের কোন নিশ্চয়তা কখনো পাবে না?

পার্থিব প্রাপ্তির মধ্যেও মানুষ আপাতদৃষ্টে ভাগ্যের অসমতার শিকার হয়। কেউ ধনীর ঘরে জন্মে বিনাশ্রমে আরাম আয়েসে জীবন কাটায়, আর দরীদ্রের সন্তানরা সারাাদিন পরিশ্রম করেও দুবেলা খাবার যোগাড় করতে পারে না। ধনীরা দান-খয়রাত, যাকাত, হজ্জ পালন ইত্যাদির মাধ্যমে পুণ্য হাসিলের সুযোগ পায়, দরিদ্ররা ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও এসব কাজের পুণ্য অর্জন থেকে বঞ্চিত থাকে। অথচ তাদের এ বঞ্চনার জন্য তাদের নিজেদের কোন দোষ নেই। তাদের এ বঞ্চনার ক্ষতিপূরণ হবে না? বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের সকল পাপ-পুণ্য, ত্যাগ-স্বার্থপরতা, সুখ-দুঃখ, পাওয়া-না-পাওয়া ইত্যাদির বিপরীতে প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষের একটি আপেক্ষিক ও চূড়ান্ত সমতা লাভের দাবী আছে। সে দাবী কি তার কখনো মিটবে না?

এ সকল প্রশ্ন এবং এরকম আরো হাজারো জিজ্ঞাসার একটি মাত্র সমাধান হচ্ছে এমন এক ফায়সালার দিন, যে-দিন সকল মানুষের সকল ন্যায্য দাবী-দাওয়ার চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশ মিটানো যাবে। আর সেই দিনই হচ্ছে কিয়ামাতের দিন, যে দিন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নিজে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যে-দিন হবে মানব (ও জ্বিন) জাতির জন্য সামগ্রিক মহাসমীকরণের দিন। সে দিনই হবে সকল ভাল ও মন্দের ফয়সালা এবং ন্যায় ও অন্যায়ের পূর্ণ সুবিচারের দিন আর সকল দাবী ও ক্ষতিপূরণের দিন। পুণ্যবান দীন-হীনরাও সেদিন স্বচক্ষে দেখতে পাবে যালিম

পরাক্রমশালী শোষকদের শাস্তি আর তারা আল্লাহ্‌র কাছে প্রাণভরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে যে, এ জগতে আল্লাহ্ তাদেরকে বাড়তি ধন সম্পদ না দিয়ে এবং সম্পদের পরীক্ষায় না ফেলে তাদেরকে কতবড় কৃপা করেছেন! আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

৩৮:২৮। যারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে তাঁদেরকে কি *আমরা* ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের (কাফির ও মুশরিক) সমপর্যায়ভুক্ত গণ্য করব? কিংবা মুত্তাকী (আল্লাহ্‌ভীরু ও সংযমী)-দেরকে পাপাসক্তদের মত গণ্য করব?

২১:৪৭। কিয়ামাতের দিন *আমরা* স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদণ্ড, সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না এবং (কারো কোন) কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও তা *আমরা* (হিসাবের জন্য) উপস্থিত করব; আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে (তো) *আমরাই* যথেষ্ট।

কিয়ামাতে সন্দেহ পোষণকারী ও অবিশ্বাসীদের জন্য কুরআনে ঘোষিত সত্যের বাণী :

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

১৬:৩৮। তারা (কাফির ও মুশরিকরা) অতি দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলে, 'যার মৃত্যু হয় তাকে আল্লাহ্ কখনো পুনর্জীবিত করবেন না'। কিন্তু না, (পুনর্জীবিত করার) তাঁর এ ওয়াদা তিনি অবশ্যই পূরণ করবেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না -

১৬:৩৯। তিনি তা (পুনর্জীবিত) করবেনই, যেন তারা যে বিষয়ে মতভেদ পোষণ করত তার সত্যতা তিনি তাদের কাছে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেবেন এবং (আল্লাহ্‌র একত্ব ও পুনরুত্থানে অবিশ্বাসকারী) কাফিররাও যেন জানতে পারে যে, তারাই ছিল মিথ্যাবাদী।

৪৫:২৪। এই (মূর্খ অবিশ্বাসী) লোকেরা এও বলে যে, 'এই পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন জীবনই নেই। আমরা মরি আর বাঁচি (তা সবই এইখানে), আর কালের আবর্তনই কেবল আমাদের ধ্বংস করে। বস্তুতঃ এ ব্যাপারে এদের কোন জ্ঞানই নেই, এরা শুধু মনগড়া কথা বলে থাকে। (৪৪:৩৫ অনুরূপ)

২২:৫। হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ করো, তবে (আমার সৃষ্টির প্রক্রিয়া ভেবে দেখো) - আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি (প্রথমে

আদমকে) মাটি থেকে, তার পর শুক্র (ও ডিম্বের মিশ্রণ) থেকে, তার পর (জরায়ুতে সংলগ্ন) রক্তপিণ্ড (ভ্রূণ) থেকে, তার পর মাংসপিণ্ড থেকে, - যা পূর্ণাকৃতি হয় (এবং সন্তানে পরিণত হয়) অথবা কিছু অপূর্ণাকৃতি (নষ্ট) হয়ে যায়, - এজন্য যে, তোমাদের কাছে যেন আমি (আমার সৃষ্টি কৌশল) প্রকাশ করে দেই; আর যা আমি (পূর্ণ মানুষ করতে) চাই তা আমি মাতৃগর্ভে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য অবস্থান করাই, অতঃপর আমি তোমাদেরকে (সেখান থেকে) শিশুরূপে বের করি, যেন তোমরা তৎপর তোমাদের পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করো; আর তোমাদের মধ্যে কারো (বয়স্ক হওয়ার পূর্বে) মৃত্যু ঘটানো হয়, আর কাউকে জীবনের দুর্বলতম (বার্ধক্যের) বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়, যার ফলে তারা যা কিছু জানত সে সম্পর্কেও আর সজ্ঞান থাকে না। আর (সৃষ্টি প্রক্রিয়ার আরেকটি দিক) ভূমিকে দেখ, (যা ছিল) শুষ্ক অনাবাদী, তৎপর যখন আমি তার উপর বারি বর্ষণ করি তখন তা শস্যশ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয়ে উঠে এবং উদ্গত করে সর্ব রকম নয়নাভিরাম উদ্ভিদরাজি ।

২২:৬। এসব (জীবন চক্র) এজন্যই (ঘটে) যে, আল্লাহ্ই সত্য এবং তিনি মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনিই সর্ব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

২২:৭। এবং (কিয়ামাতের) নির্ধারিত সময় আসবেই, এতে কোন সন্দেহ নেই, এবং কবরে যারা (শায়িত) আছে, তাদেরকে আল্লাহ্ নিশ্চয় উত্থিত করবেন। (২৩:১২ - ২৩:১৬ অনুরূপ)।

৩০:২৭। আল্লাহ্ই প্রথম সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি তার পুনরাবৃত্তি ঘটান; এবং এটা (পুনরুত্থান বা পুনঃসৃষ্টি) তাঁর জন্য অতি সহজ। . . . . . . ।

অনুরূপ আরো আয়াত : ১৪:১৯~২০, ২৭:৬৪, ৩৬:৭৭~৮৩, ৪০:৫৭, ৪১:৩৯, ৪৬:৩৩, ৩০:২৭, ৩১:২৮, ৫০:১৫, ৫০:৪২ ইত্যাদি।

অবিশ্বাসীরা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতে চায় না এই যুক্তিতে যে, মৃত্যুর পর অস্থি-মাংস পচে মাটিতে বিলীন হয়ে গেলে ওটাতে আবার কেমন করে পুনর্গঠন ও প্রাণের সঞ্চার হবে? (আয়াত ৩৬:৭৮)। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, অবিশ্বাসীরা এই সহজ যুক্তিটিও বুঝতে অপারগ যে, পুনর্বারের সৃষ্টি তো প্রথম বারের সৃষ্টির চাইতে সহজতর। আর মানুষ নিজের অস্তিত্ব তথা প্রথমবারের সৃষ্টিকে যখন স্বীকার করছে তখন তার নিজের সৃষ্টির কথাই ভাবুক - সে তো ছিল মাত্র একটি শুক্র বিন্দু, যা মাতৃগর্ভে পৌঁছানো ছাড়া মানুষের আর কিছুই করার নেই। ঐ

বিন্দুকে মানবাকৃতিতে রূপ দেয়া, তাতে প্রাণ দেয়া এবং একটি জীবন্ত শিশু হিসেবে পৃথিবীতে আনা - এতে মানুষের কোন হাত নেই, কোন ক্ষমতা বা চেষ্টা-তদবীরও নেই। এ কাজ একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ্‌র। ঠিক তদ্রূপ তিনি অস্তিত্বহীনতা থেকে সব কিছুকেই সৃষ্টি করেন এবং তিনি সকল প্রাণীর মৃত্যু ঘটান। তা হলে যিনি এত বড় ক্ষমতাধর তিনি কিয়ামাতের দিন মানুষকে আবার তার পূর্ব পরিচয়ে সৃষ্টি করতে অক্ষম? এজন্য ৩১:২৮ আয়াতে মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের সবারই সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ।" আর এর কারণ কোন কিছু হওয়ার ব্যাপারে তাঁর হুকুমই যথেষ্ট, এর জন্য কোন সময়, দ্বিতীয় হুকুম, সহায়ক বা উপকরণ-যন্ত্রপাতি কিছুরই দরকার নেই। অনুরূপভাবে আয়াত ৪০:৫৭ তে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, "অবশ্যই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (ও এ সবের যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু ও প্রাণীর) সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি করা হতে বহুগুনে বড় ও কঠিন..... ।" অতএব যিনি এসবের সৃষ্টিকর্তা তাঁর পক্ষে মাটি থেকে মানব সৃষ্টি করে তার মৃত্যু ঘটিয়ে তাকে আবার মাটি থেকে পুনরুজ্জীবিত করা অবশ্যই এক অতি তুচ্ছ ব্যাপার। এই কথাটাই প্রকাশ পেয়েছে ৪৬:৩৩ নং আয়াতে।

সহীহ্ মুসলিমে (৩৫৬, ৩৫৭ নং হাদীস) আছে, "কাদায় পড়ে থাকা শস্য বীজ যেমন বৃষ্টি বর্ষণের ফলে অংকুরিত হতে থাকে, কিয়ামাতের দিন মানুষের দেহ তেমনি অংকুরিত হতে শুরু করবে।" যখন দেহ পূর্ণরূপে গঠিত হয়ে যাবে তখন ইসরাফিল (আ) এর শিংগায় ফুৎকার দেয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্‌র নির্দেশে সমস্ত রূহ নিজ নিজ দেহে প্রবেশ করবে এবং মানুষ হাশরের মাঠে দৌড়াতে দৌড়াতে গিয়ে হাজির হবে।

কুরআনুল কারীমের তিনটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী (সা) কে কসম খেয়ে কিয়ামাতের সত্যতা বর্ণনা করতে বলেছেন।

১০:৫৩। তারা তোমার নিকট জানতে চায় যে, এটা (কিয়ামাত) কি সত্য ? বলো, হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ! এটা অবশ্যই সত্য। আর তোমরা এটা ব্যর্থ করতে পারবে না।

৩৪:৩। কাফিররা বলে, আমাদের (কাছে) কিয়ামাত আসবে না। বল, আসবেই, শপথ আমার প্রতিপালকের! নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট ওটা আসবেই..... ।

৬৪:৭। কাফিররা ধারণা করে যে, তারা (বিচারের জন্য) কখনো পুনরুত্থিত হবে না। বল (হে মুহাম্মাদ সা!), আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে! অতঃপর তোমরা যা করতে সে সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই অবহিত করা হবে। আর এটা আল্লাহ্‌র জন্য অতি সহজ।

পৃথিবীতে আল্লাহ্ কর্তৃক মৃতকে জীবিত করার উদাহরণ :

পৃথিবীতে আল্লাহ্ কর্তৃক মৃতকে পুনর্জীবিত করার অনেক উদাহরণ আছে, যা থেকে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। সূরা বাকারাতেই একাধিক উদাহরণ বিদ্যমান। যেমন মূসা (আ) এর সময় আল্লাহ্‌র নির্দেশে একজন নিহত লোকের দেহে জবাই করা একটি গরুর এক টুকরা মাংস দিয়ে আঘাত করা হলে লোকটি জীবিত হয়ে উঠে এবং তার হত্যাকারীর পরিচয় জানিয়ে দেয় (২:৭৩)। ইব্রাহীম (আ) চারটি পোষা কবুতরকে কেটে টুকরা টুকরা করে কয়েকটি পাহাড়ের উপরে ছড়িয়ে দেন, তার পর তিনি কবুতরগুলোকে নাম ধরে ডাক দেয়া মাত্র তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশে আবার নিজেদের পূর্বের দেহ ও প্রাণ ফিরে পায় এবং নবী (আ) এর কাছে চলে আসে (২:২৬০)। ঈসা (আ)ও আল্লাহ্‌র নির্দেশে মৃতকে জীবিত করতে পারতেন (৫:১১০)। আর জড় বস্তুর প্রাণ লাভ করার অনেক নিদর্শনতো আমরা দৈনন্দিন জীবনে হর হামেশাই দেখছি, যেমন ডিম থেকে বাচ্চা বের হওয়া, খালি মাঠে বৃষ্টির পরই উদ্ভিদ ও ফল-ফসলের প্রাণ চাঞ্চল্য ফিরে আসা (৩৬:৩৩ ও ৭:৫৭~৫৮) ইত্যাদি।

২.২। জীবন ও মৃত্যুর সংজ্ঞা ও উভয়ের পার্থক্য

বস্তুবাদী ও অবিশ্বাসীদের কাছে 'জীবন' এর অর্থ প্রাণ নিয়ে সচল থাকা এবং 'মৃত্যু' অর্থ হচ্ছে প্রাণ বিয়োগ ঘটে চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া; অর্থাৎ মৃত্যুতে দেহের চালিকা শক্তি অকর্মণ্য হয়ে যাওয়া এবং দেহ মাটিতে মিশে যাওয়া, যার আর পরবর্তী কোন ধাপ (পুনরুত্থান ইত্যাদি) নেই। খাঁটি ঈমানদারগণ কিয়ামাত সম্পর্কিত আল্লাহ্‌র বাণীকে বিনা যুক্তিতে মেনে নেন। তাদের সংখ্যা অতি অল্প। মাঝখানের দুর্বল ঈমানের লোকজনদের জন্য জীবন ও মৃত্যু এবং পুনরুত্থান সম্পর্কিত কিছু বাস্তব ও যুক্তিভিত্তিক তথ্য জানা প্রয়োজন।

'মৃত্যু' অস্তিত্বের এক অবস্থা মাত্র, নিঃশেষ বা চিরবিনাশ হওয়া নয়

অতীত যুগের লোকের তুলনায় বর্তমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগের মানুষের পক্ষে 'মৃত্যু' সম্পর্কিত সঠিক ধারণাকে বিশ্বাস ও গ্রহণ করা সহজতর। কারণ এখন মানুষ সহজেই বুঝতে পারে যে, কোন জড় পদার্থের অস্তিত্বের বিলুপ্তি প্রকৃত পক্ষে তার এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর মাত্র, চির বিলুপ্তি নয়। যেমন পানিকে যদি তার মূল অণুদ্বয় অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন-এ বিভক্ত করে ফেলা হয় তাহলে পানির 'মৃত্যু' হয়, অর্থাৎ পানি হিসাবে তার অস্তিত্ব বর্তমান থাকে না, কিন্তু অন্য দুটি মৌল পদার্থের 'সৃষ্টি' হয়। কিন্তু এই 'মৃত' পানি পুনরায় ঠিক পানি হিসেবেই জন্ম লাভ করে যখন যথা নিয়মে আবার অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন একত্রিত হয়। তখন আবার অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের অস্তিত্ব বিলোপ বা 'মৃত্যু' হয়। পানি আবার অন্য যৌগ পদার্থের সাথে মিশেও পানি হিসেবে তার অস্তিত্ব হারায়, তখন অন্য আরেকটি যৌগ পদার্থের সৃষ্টি হয়। বস্তু জগতে এই গঠন ও বিভাজন প্রক্রিয়া নিয়ত চলছেই।

প্রাণী জগতের মধ্যেও জীবন ও মৃত্যুর প্রক্রিয়া অনুরূপ, তবে তাদের মধ্যে আছে একটি অতিরিক্ত উপাদান, তথা প্রাণ বা চালিকা শক্তি, যা তার জীবিত থাকার জন্য অপরিহার্য এবং যা তাকে চলাচল করতে, আয়তনে বৃদ্ধি পেতে, চিন্তা ও কাজ করতে, বয়ঃপ্রাপ্তির পর সন্তান জন্ম দিতে এবং অনুরূপ অন্যান্য বহুবিধ কাজের সামর্থ্য যোগায় যা জড় বস্তুর নেই। মূলতঃ এই চালিকা শক্তি যখন প্রাণীর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন প্রাণীর 'মৃত্যু' হয়, কিন্তু চালিকা শক্তি, মানুষের বেলায় যা আত্মা হিসেবে পরিচিত তা বিনষ্ট বা নিঃশেষ হয়ে যায় না। তেমনি মানুষের মাটির দেহও অন্যান্য জড় পদার্থের মতই বিভাজন প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে আবার মাটিতে মিশে যায়, চির বিলুপ্ত হয় না।

জীবনের চালিকা শক্তির উৎস :

যে-কোন চলমান বস্তুর শক্তির একটি উৎস আছে। যেমন আমাদের মাথার উপর যে বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরছে তার চালকশক্তি তথা বিদ্যুৎ আসছে দূরে কোন একটি ইলেকট্রিক জেনারেটর বা বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র থেকে। সেই জেনারেটর এর শক্তির যোগানদার হচ্ছে একটি ইঞ্জিন অথবা টারবাইন, যার শক্তির উৎস হচ্ছে কোন প্রকার জ্বালানী তেল, গ্যাস, পানি বা পানি থেকে সৃষ্ট বাষ্প, কিংবা অনুরূপ

অন্য কোন প্রাকৃতিক শক্তি। এই জ্বালানী তেল, গ্যাস ইত্যাদির উৎপত্তি হয়েছে গাছপালা ও অন্যান্য জৈব পদার্থের লাখ লাখ বছরের পরিবর্তিত অবস্থা থেকে, আর সেই গাছপালার জীবনের উপাদান হচ্ছে মাটি, পানি আর সূর্যের আলো। এ পর্যন্ত না হয় আমরা শক্তি ও জ্বালানীর উৎসের সন্ধান করতে পারলাম। কিন্তু সূর্যের এবং সূর্যের মত আরো হাজার হাজার কোটি নক্ষত্রের যে আলো বা তাপ শক্তি অনন্ত কাল থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার উৎস কোথায়?

অপর দিকে যদি আমরা কোন পদার্থের বিভাজন প্রক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য করি তা হলে দেখব, আমরা অণু ও পরমাণু (ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন ইত্যাদি) পর্যন্ত পৌছতে পারি, এই অণু-পরমাণুগুলোকে যদি আরো ভাঙ্গা যায় তবে তা কি হবে অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত যে বস্তুটিতে পৌছানো যাবে যার পর আর বিভাজন সম্ভব নয় সে বস্তুটি কি বা তার প্রকৃতি কি হবে? সেটি হতে পারে একটি ক্ষুদ্রতম শক্তি বা আলোক পিণ্ড। এ অনুমান অযৌক্তিক নয়, কেননা মানুষ (আইনস্টাইনের থিওরী প্রয়োগ করে) আণবিক বিক্রিয়ায় পদার্থকে সরাসরি শক্তিতে রূপান্তরিত করেছে এবং তা বিদ্যুৎ উৎপাদন অথবা আণবিক বোমা বিস্ফোরণে কাজে লাগিয়েছে। সামান্য কয়েক আউন্স বস্তুকে (নিয়ন্ত্রণহীনভাবে) যদি এভাবে সরাসরি শক্তিতে রূপান্তর করা যায় তা হলে সে শক্তির পরিমাণ (ও ভয়াবহতা) মানুষ আণবিক বোমার ধ্বংস ক্ষমতা থেকে বুঝতে ও জানতে পেরেছে।

তাহলে এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে, এ মহাবিশ্বে কী পরিমাণ শক্তির উপস্থিতি আছে, অর্থাৎ এ বিশ্বের সকল বস্তুকে যদি সরাসরি পুরো মাত্রায় আণবিক বোমার প্রক্রিয়ার মত করে শক্তি বা আলোতে রূপান্তর করা যায় তবে সে শক্তির মোট পরিমাণ বা আলোর মোট ব্যাপ্তি কতটুকু হবে? এ শক্তির মোট পরিমাণ মানুষের সকল ধারণা ও কল্পনার সম্পূর্ণ বাইরে। তা হলে এ বিশ্বের সব বস্তু বা শক্তির যিনি স্রষ্টা তাঁর জ্ঞান ও শক্তি কতটুকু? মানুষ শুধু একটি শব্দই এর উত্তরে ব্যবহার করতে পারে, আর তা হচ্ছে - অসীম। অতএব আমরা এইটুকুও বলতে পারি, মহাবিশ্বে এই যে অকল্পণীয় পরিমাণ শক্তি সুপ্ত অথবা প্রকাশিত আছে তা শুধু সেই মহান স্রষ্টার জ্ঞান, শক্তি ও মাহাত্ম্যেরই এক নিদর্শন, যাঁর অসীম জ্ঞান এবং নির্দেশনা ব্যতীত বিশ্বের একটি অণু বা পরমাণুও তার নিজস্ব গণ্ডীর বাইরে কিছু করতে সক্ষম নয়। এজন্য তিনি বলেন, তোমাদেরকে অতি অল্প পরিমাণ জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।

কুরআনের ভাষায় :

২৪:৩৫। আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (সমগ্র) নূর (আলো বা জ্যোতি)....., (যার বিস্তার) নূর এর (স্তরের) উপর নূর (এর স্তর)! আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তাঁকে এই নূরের দিকে হিদায়াত করেন। আল্লাহ্ (এভাবে) মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে পূর্ণভাবে অবগত আছেন।

পূর্ণ আয়াতটির প্রকৃতি আধ্যাত্মিক স্তরের, মানুষের পক্ষে এর সার্বিক ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর নয়। তবে এতটুকু বুঝা যায় যে, আল্লাহ্র নূর বা জ্যোতি আমাদের কাছে দৃশ্যমান কোন জ্যোতি বা আলোর মত নয়, এ নূর আল্লাহ্র সর্বময় জ্ঞান ও শক্তির পরিচায়ক।

যেমন কুরআনুল কারীমকে আল্লাহ্ নূর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন (আয়াত ৪:১৭৪, ৭:১৫৭, ৩৩:৪৬, ৪২:৫২, ৬৪:৮ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য), কেননা এই বাণী হচ্ছে আল্লাহ্র অসীম জ্ঞানের নিদর্শন এবং এর দ্বারা তিনি মানুষকে (যাকে ইচ্ছা) হিদায়াত করেন। তেমনি পূর্ববর্তী রাসূলগণের কাছে প্রেরিত কিতাবসমূহকেও আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত ৫:৪৪-৪৬, ৬:৯১, ৩৫:২৫ তে নূর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

প্রাণীর জীবনের যে চালিকা শক্তি, যা দ্বারা সে জীবন প্রাপ্ত হয়, তার উৎস হচ্ছে এই নূর। আল্লাহ্র নির্দেশেই তাঁর নূর থেকে সৃষ্টি হয় আত্মার বা মানুষের জীবনের চালিকা শক্তি। তবে আল্লাহ্ তা'আলা যেসকল বিষয় বা বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করেছেন কিন্তু সেগুলির বিস্তারিত কোন জ্ঞান দেননি (অর্থাৎ সে জ্ঞান কেবল নিজের কাছে সীমাবদ্ধ রেখেছেন) তার মধ্যে একটি হচ্ছে আত্মা। তিনি বলেন,

১৭:৮৫। তারা (ইয়াহুদীরা) আপনাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন (হে রাসূল!), রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ থেকে (সরাসরি আসা এক সত্তা, যা সম্পর্কে কেবল তিনিই জানেন), আর জ্ঞান তোমাদেরকে (মানবজাতিকে) অতি অল্প পরিমাণই দেয়া হয়েছে।

উপরের এই আলোচনা থেকে এটাই বুঝতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, কোন প্রাণীর মৃত্যুর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, তার জড়বস্তুর দেহ থেকে তার সত্তার চালিকা শক্তির (বা প্রাণ এর, মানুষের বেলায় রূহ বা আত্মার) বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মাত্র। আর এতদুভয়ের সংযোগ ঘটিয়ে যে সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তা'আলা

প্রাণীকুলের সৃষ্টি করেন এবং এতদুভয়কে বিচ্ছিন্ন করে তাদের মৃত্যু ঘটান, তাঁর পক্ষে পুনর্বার সেই দেহ ও প্রাণ একত্র করে দেয়ার বিষয় কেমন করে মানুষ অবিশ্বাস করতে পারে?

মানুষের মৃত্যু তাই তার পরবর্তী আরেক জীবনের শুরুর পূর্বের এক বিশেষ অবস্থা মাত্র, যখন তার প্রাণ বা আত্মাকে এক অপেক্ষার জগতে অটুট অবস্থায়ই রাখা হয়।

'জীবন' এর বিভিন্ন প্রকৃতি বা পর্যায়

জীবন মূলতঃ যে কোন বস্তুর নিজস্ব বিশেষ আকৃতি ও প্রকৃতি নিয়ে টিকে থাকা, যতক্ষণ না সেই বস্তু সংযোজন বা বিভাজন প্রক্রিয়ায় নিজের মূল আকৃতি ও প্রকৃতি হারিয়ে ফেলে এবং অন্য আকৃতি বা প্রকৃতি বিশিষ্ট কোন ভিন্ন বস্তুতে রূপান্তরিত হয়, তথা 'মৃত্যু' বরণ করে। এই বিচারে মহাবিশ্বের সব কিছুরই একটি 'জীবন' আছে এবং প্রত্যেক বস্তুরই একদিন 'মৃত্যু' হবে। সবশেষে আল্লাহ্‌র নির্দেশে চূড়ান্ত দিনে সবকিছুই 'মৃত্যু' বরণ করতঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে আবার নতুন বিশ্বের সৃষ্টি হবে।

তবে বিভিন্ন প্রকারের 'জীবন' - এর মধ্যে পার্থক্য আছে, যা নির্ভর করে সে জীবন আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কতটুকু জ্ঞান ও শক্তি পেয়েছে। পশু পাখিরও জ্ঞান এবং শক্তি আছে, যা মানুষের তুলনায় নেহায়েত কম। তাদের ভাষাও আছে। তাদের ভাষা না বুঝলেও তাদের অনেকের শব্দ আমরা প্রকাশ্যেই শুনতে পাই এবং বুঝতে পারি যে, সেই শব্দ দ্বারা তারা ভাব ও জ্ঞানের আদান প্রদান ঘটিয়ে থাকে। জড় বস্তু আপাতঃদৃষ্টিতে জড় হলেও তার ভিতরের প্রতিটি অণু-পরমাণু চির চলমান এবং প্রত্যেক জড় বস্তুর স্বাভাবিক কম্পনের গতির মধ্যদিয়েও তার নিজের জীবনের অস্তিত্বের ভিন্নতা এমন কি তার 'ভাষা'ও প্রকাশ পায়, যা আমাদের পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়। (জড় বস্তুর কম্পনকে আমরা যখন কৃত্রিমভাবে আমাদের শ্রবণশক্তির মাত্রার সীমায় নিয়ে আসি, তখন আমরা তা শুনতে পাই, যেমন বাদ্যযন্ত্র, রেডিও-টিভির স্পীকার ইত্যাদির মাধ্যমে)। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

১৭:৪৪। সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে; আর এমন কিছুই নেই, যা তাঁর

সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তাদের (যারা আল্লাহ্র) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা (এর ধরন বা ভাষা) তোমরা অনুধাবন করতে পার না; নিশ্চয়ই তিনি সর্বাপেক্ষা সহনশীল ও ক্ষমাপরায়ণ। (অনুরূপ আয়াত ২৪:৪১, ৫৭:১, ৫৯:১, ৬১:১, ৬২:১ ইত্যাদি)।

২১:৭৯। . . . . . *আমরাই* পর্বত ও বিহঙ্গকুলকে (নবী) দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম যাতে তারাও তার সাথে *আমাদের* পবিত্রতা ঘোষণা করত; এবং *আমরাই* (এ সবকিছু) ঘটাচ্ছিলাম। (অনুরূপ আয়াত ২৪:৪১, ৩৮:১৮ ও ৩৮:১৯)।

জড় বস্তুর তুলনায় গাছপালার জীবন 'উন্নততর' শ্রেণীর, কারণ তারা বাড়ে, চারা সন্তানের জন্ম দেয়, এমনকি কিছু কিছু উদ্ভিদ নড়তে বা চলতেও পারে। পশু-পাখির মধ্যে চলাচল ক্ষমতা এবং কম-বেশী বুদ্ধিও আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে ভালমন্দ বুঝার ক্ষমতা বা অন্যান্য গুণাগুণ নেই যা মানুষের মধ্যে আছে।

হাদীসে আছে, যে খেজুর গাছের কাণ্ডের উপর হেলান দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুৎবা দিতেন, মিম্বর তৈরী হওয়ার পর সে কাণ্ডটিকে সরিয়ে ফেলা হলে কাণ্ডটি তখন অঝোরে কাঁদতে থাকে। (সহীহ্ বুখারী - ২.৪১)।

অপর একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'আমি মক্কার ঐ পাথরকে চিনি যা আমার নবুওয়াতের পূর্বে আমাকে সালাম করতো। কুরআনের আয়াত ও এসব হাদীস দ্বারা এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে এসব জিনিসের মধ্যে শুধু 'প্রাণ'ই আছে তা নয়, এদের মধ্যে প্রকৃত অর্থে আবেগ এবং অনুভূতিও আছে।

সহীহ্ বুখারীতে এই হাদীসটিও আছে যে, ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর যুগে তাঁরা খাদ্য খাওয়ার সময় খাদ্যের তাসবীহ্ শুনতে পেতেন। এরকম আরো একাধিক হাদীস আছে।

মানব জীবনের বিবিধ অধ্যায় :

প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীল দুটি অংশ হচ্ছে তার দৃশ্যমান শরীর ও তার অদৃশ্য চালিকা শক্তি। মানুষ জীবন প্রাপ্ত হয় তার জীবনের চালিকা শক্তি রূহ এর মারফত, আবার মানুষের শরীর না থাকলে রূহ এককভাবে তার অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটাতে পারে না, যেভাবে বিদ্যুৎ কোন বস্তুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত না হলে তার অস্তিত্ব বুঝা যায় না। আত্মার জগতে রূহের প্রাথমিক অবস্থান এবং পরে

শরীরের মধ্যে রূহের আগমন-নির্গমনের মাধ্যমে মানুষের জীবনের প্রধান চারটি অধ্যায় রচিত হয়, যদিও আমরা এজগতে কেবল এই পার্থিব জীবনকে দেখতে ও বুঝতে পারি। সেই চারটি অধ্যায় হচ্ছে :

(১) আত্মার জগতের অধ্যায় : জীবনের এ অধ্যায় সম্পর্কে মানুষের কোন ধারণা নেই, কারণ এ জগত কেবল আত্মার বিষয় এবং কেবল আল্লাহ্‌র কাছে তা দৃশ্যমান। মানব সৃষ্টির সিদ্ধান্তের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষের আত্মার সৃষ্টি করেন এবং প্রত্যেক আত্মা কেবল আল্লাহ্‌র নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে, কখন তাকে তার জন্য নির্ধারিত মানবদেহে প্রবেশ করতে হবে। মাতৃগর্ভে শরীর গঠিত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে মানবদেহে আত্মার প্রবেশ ঘটে এবং মানবদেহে প্রাণের সঞ্চার হয়। ইবনে কাসীর ২২:৫ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুসনাদে আহ্‌মাদ থেকে একটি হাদীস উদ্ধৃত করে বলেন, মানব ভ্রূণের বয়স যখন ১২০ দিন হয় তখন তাতে রূহ্ ফুঁকে দেয়া হয়।

(২) ইহ-জগতের অধ্যায় : এ অধ্যায়ই আমাদের পরিচিত অধ্যায়। মাতৃগর্ভে মানব সন্তান আত্মার মাধ্যমে জড় মাংস পিণ্ডের অবস্থা থেকে জীবন প্রাপ্ত হয়ে যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হয় একজন ঈমানদার মানুষ হিসেবে। কেননা, তার ভিতরের রূহ তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার অনেক পূর্বেই আল্লাহ্‌কে তার প্রতিপালক হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে এবং শিশু অবস্থায় তার এখনো আল্লাহ্‌র অবাধ্য হওয়ার জ্ঞান লাভ হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَإِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ.

৭:১৭২। স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তার বংশধরদের বের করেন এবং তাদের নিজেদের (আনুগত্য সম্পর্কে) স্বীকারোক্তি আদায় করেন (এই বলে) যে, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তারা বলে, 'হাঁ, আমরা অবশ্যই সাক্ষ্য দিলাম।' এর উদ্দেশ্য এ ছিল যে, কিয়ামাতের দিন তোমরা যেন না বল, 'আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম'।

আল্লাহ্ আদম (আ) এর সৃষ্টির পর তাঁরই পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সকল সন্তানদেরকে বাহিরে বের করেন। তারা নিজেরাই নিজেদের উপর সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ্ তাদের প্রতিপালক ও মালিক। তিনি ছাড়া অন্য কোন প্রকৃত উপাস্য

নেই। এটাই হচ্ছে মানব প্রকৃতির স্বীকারোক্তি এবং আল্লাহ্ এই প্রকৃতির উপরই মানুষের স্বভাব বানিয়েছেন। তাই জন্মের সময় প্রত্যেক মানব শিশুই মুসলমান হিসেবে জন্ম নেয়।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মানব শিশু বাড়তে থাকে, বুঝতে ও শিখতে থাকে এবং তেরো থেকে আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়। এই সময়ে তার মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির স্তর এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যখন সে ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে শিখে এবং এই পৃথিবীর প্রতিনিধি হিসেবে নিজ দায়িত্ব কাঁধে নেয়ার প্রাথমিক পর্যায় শুরু করে, যা আমৃত্যু তাকে বহন করতে হয়। সুতরাং এই সময় থেকেই তার সকল চিন্তা, কথা ও কর্মের সম্পূর্ণ বিবরণ দুইজন ফিরিশতা কর্তৃক একটি রেকর্ড বইয়ে (আমলনামায়) লিপিবদ্ধ হতে থাকে, কেননা তাকে অবশেষে তার সব ক্রিয়াকলাপের জবাবদিহিতা করতে হবে। মানুষ পৃথিবীতে তার আমলনামা লিপিবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়া স্বচক্ষে দেখতে না পেলেও এটিই তার অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য ও চিরস্থায়ী অংশ হয়ে দাঁড়ায়। কুরআনের ভাষায় :

৫০:১৬। ***আমরাই*** মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় সে সম্পর্কে ***আমরা*** অবগত আছি। (কেননা) ***আমরা*** তার ঘাড়ের ধমণী অপেক্ষাও (তার কাছে) নিকটতর।

৫০:১৭। আরো স্মরণ রেখো, দু'জন লিপিবদ্ধকারী ফিরিশতা তার ডান ও বামে বসে তার (প্রতিটি) কর্ম সংরক্ষণ করে।

৫০:১৮। একটি শব্দও সে উচ্চারণ করে না, যাকে সংরক্ষণ করার জন্য একজন সদা সতর্ক প্রহরী তার পাশে নিয়োজিত থাকে না।

ফিরিশতা (কিরামান-কাতিবীন) কর্তৃক আমলনামা সংরক্ষণের অদৃশ্য প্রক্রিয়ার ব্যাপারে অবিশ্বাসীরা অথবা নামেমাত্র বিশ্বাসী বস্তুবাদীগণ সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু আমরা তো অনেক কিছুই দেখতে পাই না, অথচ বিশ্বাস করি। আমরা বিদ্যুৎ দেখতে পাই? হাজার হাজার মাইল দূরে থেকে যে সব রেকর্ড করা অথবা তাৎক্ষণিক ঘটনার দৃশ্য আমরা টেলিভিশনে দেখতে পাই তা যে-সংকেত হিসেবে টিভিতে প্রবেশ করে তা আমরা দেখতে পাই? আমাদেরই তৈরী যে রোবট, তাকে দিয়ে আমরা ভাল-মন্দ কাজ করিয়ে তার সকল কাজকে আমরা

রেকর্ড করে রাখতে পারি এবং সেই রোবট নষ্ট হয়ে গেলে মূল ডিজাইন বা নক্সা অবলম্বনে তাকে পুনর্নির্মাণ করত তাকে তার পূর্বের কার্যাবলী পর্দায় দেখিয়ে দিতে পারি। আমরা সৃষ্ট বস্তু হয়ে যদি এসব কাজ করতে পারি (যদিও পূর্বাপর সমগ্র মানবকুল, জ্বিন ও ফিরিশতা সকলে মিলে একটি অণু বা পরমাণু নিজেরা সৃষ্টি বা স্থায়ীভাবে ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখি না), তা'হলে যিনি আমাদের সবাইকে এবং মহা বিশ্বের সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন এবং সবার রিয্ক যোগান দিচ্ছেন, তাঁর জন্য তাঁর এক সৃষ্ট জীবের কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়ে রাখা কি একটি অতি তুচ্ছ কাজ নয়?

(৩) আলম-এ-বর্যখ অধ্যায়, তথা মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামাতের পূর্বের সময় পর্যন্ত আত্মার অন্তরীণ বা অক্ষম অবস্থায় থাকার অধ্যায়

প্রত্যেক প্রাণীকে অবশ্যই মৃত্যু বরণ করতে হবে। মৃত্যুর প্রক্রিয়ার তথা প্রাণ বের হওয়ার সময়কার অকল্পনীয় কষ্টও প্রত্যেক মানুষকে কমবেশী ভোগ করতে হবে।

মৃত্যুর পর শরীর মাটিতে মিশে যায় এবং আত্মা আল্লাহ্ কর্তৃক এক নির্ধারিত স্থানে নীত হয়। মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামাতের পূর্ব পর্যন্ত মানব জীবনের এই জগৎকে আলম-এ-বর্যখ তথা অন্তরালের জগৎ বলা হয়। ইহকাল ও পরকালের মধ্যবর্তী এই জগতের সবদিক অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর, মাঝখানে কেবল দেহহীন মানবাত্মার জগত। মৃত্যুর সাথে সাথে তাদের দেহকে মাটিতে মিশতে দিয়ে আত্মাকে আল্লাহ্র আদেশে এখানে রাখা হয়েছে ক্ষমতাহীন করে। প্রত্যেক প্রাণকে এখানে আসতেই হবে এবং কিয়ামাতের পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত এখানে থেকে কিয়ামাতের দিনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى.

২০:৫৫। ***আমরা*** মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তাতেই ***আমরা*** তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব এবং তা থেকেই ***আমরা*** তোমাদেরকে পুনর্বার বের করে আনব।

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ط أَفَائِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُوْنَ.

২১:৩৪। আমি তোমার (রাসূল সা) পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি.....।"

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ط وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ط وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ.

২১:৩৫। জীবনমাত্রেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে; (হে মানুষ) আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল (এ উভয় অবস্থা) দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং পরিশেষে আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। (অনুরূপ আয়াত ৩:১৮৫, ২৯:৫৭ ইত্যাদি)।

ইবনে কাসীর ২১:৩৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াত দ্বারা আলিমগণ দলিল গ্রহণ করেছেন যে খিযর (আ) মারা গেছেন, কেননা তিনি তো মানুষই ছিলেন। সুতরাং কিছু লোক (বিশেষত সূফীবাদের কিছু সমর্থক) কোন দলিল ছাড়াই দাবী করে যে তিনি এখনো বেঁচে আছেন, এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

মানুষের মৃত্যুকালীন সময় - বিশ্বাসীদের অবস্থা :

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلاَّ تَخَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ.

৪১:৩০। যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ্', তৎপর (সেই বিশ্বাসে) অবিচলিত ও অটল থাকে, তাদের প্রতি (সময় সময়) ফিরিশতাগণ অবতীর্ণ হয় এবং বলে, 'তোমরা ভীত হয়ো না, কিংবা চিন্তিত হয়ো না, বরং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ গ্রহণ করে আনন্দিত হও।

نَحْنُ اَوْلِيَآؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ج وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ.

৪১:৩১। 'আমরা পার্থিব জীবনে তোমাদের সহায়ক বন্ধু আছি এবং পরকালেও (থাকব)। সেখানে তোমাদের মন যা কিছু চাইবে তাই মজুদ রয়েছে এবং

সেখানে তোমরা যা কিছু ফরমায়েশ করবে তাই তোমাদের জন্য (হাযির) থাকবে।'

نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ

৪১:৩২। এই হচ্ছে পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে (তোমাদের প্রতি) মেহমানদারী!

কবর থেকে উঠার সময়ও ফিরিশতাগণ মু'মিনদের একই আশ্বাস ও সুসংবাদ দেবেন।

মৃত্যুকালীন সময় - কাফিরদের অবস্থা :

৮:৫০ - আর যদি তুমি (ঐ অবস্থা) দেখতে পেতে যখন ফিরিশতারা কাফিরদের প্রাণ হরণ করে; তারা তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হানে এবং বলে, 'তোমরা (জ্বলন্ত আগুনের) দহন যন্ত্রণা ভোগ কর।'

৮:৫১। এই (শাস্তি) হলো তোমাদের সেই কাজের পরিণাম যা তোমাদের হস্তদ্বয় পূর্বে প্রেরণ করেছিল; (নতুবা) আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাঁর বান্দাদের উপর যুলমকারী নন।

২৩:৯৯~১০০। শেষ পর্যন্ত তাদের (মুশরিক ও পাপীদের) কারো মৃত্যু এসে যাবে তখন বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ফিরিয়ে দিন, যেন আমি ভাল কাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম; না এটা কখনো হবার নয়.....। অনুরূপ আয়াত - ৬৩:১০~১১, ১৪:৪৪ ইত্যাদি।

সূরা ৭৯ এর আয়াত ১ এবং ২ এর তাফসীরে বলা হয়েছে যে, কাফিরদের রূহ টেনে হিঁচড়ে বের করা হয় (কেননা সে আযাবের কথা জেনে যাবে এবং বের হতে চাইবে না) এবং পুণ্যবানদের রূহ এমন সহজভাবে বের করা হবে যেন একটি বাঁধন খুলে দেয়া হয়েছে।

মৃত্যুর পর আত্মার যাত্রা :

ইবনুল কাইয়িম তাঁর কিতাবুর রূহ পুস্তকে লিখেছেন.

মৃত্যুর সময় মানুষ মৃত্যুর ফিরিশ্তা (আযরাইল আ)-কে দেখতে পায়, তাঁর কথা

শোনতে পায় এবং তাঁর সঙ্গে কথাও বলে। কিন্তু তা তার চোখ, কান বা জিহ্বা দ্বারা নয় এবং এই দেখা, শোনা বা কথা বলার প্রক্রিয়াও মানুষের জ্ঞানের বাইরে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিশতারা মৃতের আত্মা নিয়ে উর্ধ্বাকাশে গমন করেন। এক আকাশমণ্ডল পেরিয়ে অন্য আকাশমণ্ডল হয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মাকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সমীপে হাজির করা হয় এবং তাঁর নির্দেশে সেখানে তার নাম নথিভুক্ত হওয়ার পর তাকে আবার পৃথিবীতে পাঠানো হয়। রূহ ফিরে এসে তার শরীরের গোসল করানো, কাফন পরানো এবং কবরে শায়িত করে জীবিত লোকদের চলে যাওয়া প্রত্যক্ষ করে। তারপর তাকে তার দেহে প্রবেশ করানো হয় এবং কবরের দুইজন ফিরিশতার প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। সে পাপী হলে শাস্তির সম্মুখীন হয়, কিন্তু তার অনুভূতির সাথে জীবিত মানুষের অনুভূতি কোনভাবে তুলনীয় নয় এবং দেহে তার আত্মার প্রবেশ দ্বারা এও বুঝায় না যে সে জীবিতদের মত চলবার, দেখবার বা অন্য কোন কর্ম করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে যায়। প্রশ্নোত্তর পর্বের পর আত্মা আলমে বারযাখে নীত হয় এবং দেহ মাটিতেই থাকে এবং তথায় মিশে যায়। তথাপি দেহের সঙ্গে আত্মার একটি সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে যার প্রকৃতি মানুষের বোধগম্য নয়। এই সম্পর্ক থাকার কারণেই পাপী বা পুণ্যবান হওয়া অনুযায়ী আত্মা ও দেহ উভয়ই শাস্তি বা আনন্দ উপলব্ধি করতে থাকে। কবরের শাস্তি ও মৃতের চিৎকার মানুষ ও জ্বিন ছাড়া আর সব প্রাণী শুনতে পায়।

মৃতদের কবরে জিজ্ঞাসাবাদ ও কবরের আযাব :

সহীহ্ বুখারীতে (নং ২.৪৫৬ ইত্যাদি) আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, কবরে শায়িত করার পর মানুষের আত্মাকে তার মৃত দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং তাকে বসিয়ে দেয়া হয়। তখন দু'জন ফিরিশ্তা তাকে তার রব, তার ধর্ম ও তার নবীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। ঈমানদার লোক এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবে। কিন্তু কাফির বা মুনাফিক হলে সে উত্তর দেবে যে সে জানে না, আর তাকে লোহার মুগুর দ্বারা এমনভাবে আঘাত করা হবে, যার ফলে সে এমন বিকট শব্দে চিৎকার করে উঠবে যে মানব ও জ্বিন জাতি ব্যতীত তার আশে পাশের সকলেই তা শুনতে পাবে।

বারা' ইবনু আযীব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

"মুসলিম বান্দাকে যখন তার কবরে প্রশ্ন করা হয় তখন সে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল।" সহীহ্ বুখারী-৬.২২১।

ইমাম আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ্ (র) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, যখন কাফির বান্দাকে ফিরিশতারা জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার প্রতিপালক কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার কাছে যাকে প্রেরণ করা হয়েছিল (রাসূল) তিনি কে?' তখন প্রতি প্রশ্নের উত্তরে সে বলতে থাকে, 'হায়! হায়! আমি তো তা জানি না।' ঐ সময় আকাশ থেকে ঘোষণাকারীর ঘোষণা শোনা যায়, "আমার বান্দা মিথ্যাবাদী। তার জন্য জাহান্নামের আগুনে বিছানা বিছিয়ে দাও এবং জাহান্নামের দিকে দরজা খুলে দাও।" সেখান থেকে তার কাছে জাহান্নামের বাতাস ও বাষ্প আসতে থাকে। তার কবর এত সংকীর্ণ হয়ে যায় যে, তার দেহের এক পাঁজর অন্য পাঁজরের মধ্যে ঢুকে পড়ে.....।

কবরের শাস্তি কেবল আত্মার শাস্তি না দেহ এবং আত্মা উভয়ের শাস্তি - এ প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে (৪০:৪৬ আয়াতের) উল্লেখ করেছেন যে, এই শাস্তি দেহ এবং আত্মা উভয়ের উপর হয়ে থাকে এবং ৪০:৪৬ আয়াতটি কবরের আযাবের একটি প্রমাণও বটে (যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা ফির'আউন সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেছেন, "সকাল সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে .....।" কবরের শাস্তি দেহ এবং আত্মা উভয়ের, ফিকাহ্-আস-সুন্নাহ্ ৪.৮৯খ-তেও এর উল্লেখ আছে।

ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মারা যায় তখন সকাল সন্ধ্যায় তার (স্থায়ী) বাসস্থান তাকে দেখানো হয়। সে জান্নাতী হলে জান্নাত এবং জাহান্নামী হলে জাহান্নাম দেখানো হয়ে থাকে। অতঃপর তাকে বলা হয়, এটা তোমার আসল বাসস্থান, যেখানে মহিমান্বিত আল্লাহ্ কিয়ামাতের দিন তোমাকে পাঠিয়ে দেবেন। (বুখারী - ২.৪৬১, মুসলিম - ৬৮৫৭, ৬৮৫৮ ও আহমাদ)।

তবে কেউই জান্নাতের প্রকৃত নিয়ামাতের আনন্দ বা জাহান্নামের প্রকৃত কষ্ট লাভ করে না, যা কিয়ামাতের দিন বিচারের পর সাব্যস্ত হয়।

মৃত্যুর পর পাপীদের আমলনামা সিজ্জীন নামক স্থানে এবং পুণ্যবানদের আমলনামা ইল্লিয়্যীন নামক স্থানে রাখা হয়।

মৃত্যু-পরবর্তী এই সময়ে মানবাত্মার নিজস্ব কোনই ক্ষমতা থাকবে না, না নিজের জন্য কিছু করার, না পরের জন্য, যদিও ইহজগতে তিনি মহা পরাক্রমশালী রাজা কিংবা অতি পুণ্যবান ব্যক্তি হয়ে থাকেন।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যখন মানুষ মারা যায় তখন তার সকল কর্ম (তথা পুণ্য বা পাপ করার ক্ষমতা) বন্ধ হয়ে যায় কেবল তিনটি আমল ব্যতীত (যার দ্বারা মৃত্যুর পরও সে লাভবান হতে থাকে) : ১. সাদাকা-এ-জারিয়া, কিংবা ২. ইল্‌ম, - যার দ্বারা (তার শিক্ষা দেওয়ার কারণে লোকের) উপকার সাধিত হতে থাকে, অথবা ৩. সু-সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে। - মুসলিম-৪০০৫। (আর অন্য মু'মিনেরাও তার জন্য দু'আ করলে তাতে তিনি উপকৃত হবেন)।

আত্মার এই জগতের সাথে তার প্রথম জগতের (মানুষের জন্মের পূর্বের) তফাৎ আছে। এখানে আত্মা এসেছে পৃথিবীতে মানুষের সাথে একত্র হওয়ার ও তার পাপ-পুণ্য ও আনন্দ-বেদনার সাথী হওয়ার সকল অভিজ্ঞতা নিয়ে এবং এতদ্‌সঙ্গে মানুষের আমলনামার বোঝা সঙ্গে নিয়ে। মানুষ ইহজগতে পাপী হয়ে থাকলে এই অন্তরালের জগত তার আত্মার কাছে কষ্টকর ও দীর্ঘ অপেক্ষার সময় মনে হতে পারে, আর পুণ্যবান হলে হাজার হাজার বৎসর পার হয়ে যাবে এক সুনিদ্রার সময় হিসেবে। তাই কিয়ামাতের পূর্ব পর্যন্ত সময় সকল মৃত ব্যক্তির জন্য একই অবস্থা বা সমমাপের সময় মনে হবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা ২৩:১০০ আয়াতে পাপীদের সম্পর্কে বলেন, "..... তাদের সামনে রয়েছে বারযাখ, সেই দিন পর্যন্ত যেদিন তারা পুনরুত্থিত হবে।" এই আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে যে, অত্যাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে যে, আলমে বারযাখেও তাদেরকে কঠিন শাস্তির মধ্যে রাখা হবে।

তবে আত্মার জগতের পরিবেশে আল্লাহ্ তা'আলার কিছু বিশেষ নির্বাচিত বান্দা, বিশেষতঃ যারা কেবল তাঁর রাস্তায় বিশুদ্ধ নিয়তে জিহাদ করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন, তাদেরকে আল্লাহ্ তাঁর অসীম রহমতে এই অপেক্ষমাণ অবস্থায় না রেখে জান্নাতের নিয়ামাত ভোগ করাবেন, কেননা তারা তাদের নিজেদের জীবন আল্লাহ্‌র রাস্তায় বিসর্জন দিয়ে আগেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন, কিয়ামাতের পরীক্ষায় পুনর্বার সম্মুখীন হওয়ার তাদের প্রয়োজন নেই! তবে এই অন্তরালের জগতে তারা মানবদেহ লাভ করবেন না, পাখির অনুরূপ আকৃতি ও প্রকৃতি প্রাপ্ত

হয়ে ঘোরাফেরা করতে পারবেন, জান্নাতের নিয়ামাত ভোগ করবেন এবং কিয়ামাতের দিন সকলের সাথে তারা আবার নিজ নিজ দেহ প্রাপ্ত হয়ে পুনরুত্থিত হবেন।

শহীদদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

৩:১৬৯। যারা আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনোই (অপরাপর মৃতের মত) মৃত মনে করো না, বরং তারা (ইহজগৎ ছেড়ে গেলেও অন্য জগতে) জীবিত এবং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে রিয্ক প্রাপ্ত হচ্ছে।

৩:১৭০। আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত; .....। (অনুরূপ ২:১৫৪ ইত্যাদি)।

সহীহ্ মুসলিমে (নং-৪৬৫১) আছে, শহীদের রূহ সবুজ রং এর পাখির দেহের মধ্যে থাকবে। জান্নাতের মধ্যে তারা যথেচ্ছ পানাহার করে ঘুরে বেড়াবে। যখন ইচ্ছা তারা আরশের সাথে ঝুলানো তাদের বাসায় বিশ্রাম নেবে। তাদের প্রতিপালক তাদের উপর প্রকাশিত হয়ে বলবেন : "তোমরা কি চাও?" উত্তরে তারা বলবে; "আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা আবার আপনার পথে জিহাদ করে শহীদ হতে পারি।" আল্লাহ্ তা'আলা জবাব দেবেন, "আমি তো এটা ফয়সালা করেই দিয়েছি যে, দুনিয়ায় কেউ পুনরায় ফিরে যাবে না।"

(৪) মানব জীবনের শেষ ও চূড়ান্ত অধ্যায় : মানব জীবনের এই অধ্যায় হচ্ছে ভয়ঙ্কর কিয়ামাতের 'দিন', যার প্রথম পর্বে আল্লাহ্র নির্বাচিত কিছু সৃষ্টি ব্যতীত মহাবিশ্বের সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় পর্বে সকল মানুষ নিজের দেহ ও প্রাণ প্রাপ্ত হয়ে, গলায় বাঁধা আমলনামাসহ পুনরুত্থিত হবে। এই দিনই চূড়ান্ত ফায়সালার দিন এবং এই দিনের ফায়সালা শেষে মানুষ নিজ নিজ কর্মফল অনুযায়ী প্রবেশ করবে জান্নাতে অথবা জাহান্নামে, যেখানে তাদেরকে কাটাতে হবে অনন্তকাল।

২.৩। কিয়ামাতের প্রথম (ধ্বংস) পর্ব

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল করিমের অজস্র আয়াতে মানব জাতিকে কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। কিয়ামাতকে যদিও একটি

দিন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তথাপি আসলে তা মানুষের সময়-জ্ঞান এর পরিমাপ অনুযায়ী হাজার হাজার বৎসরের একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার প্রধানতঃ দুটি পর্ব, প্রথম পর্ব শুরু হবে আল্লাহ্‌র নির্দেশে নির্ধারিত ফিরিশতা (ইস্রাফীল আ) যখন শিঙ্গাতে প্রথম ফুঁক দেবেন। এই সিঙ্গা ধ্বনির অকল্পণীয় রকম প্রচণ্ড শব্দের এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বের যাবতীয় বস্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। এই ধ্বংস পর্বের সৌর-জাগতিক অংশের কিছু দৃশ্য (সূর্য পশ্চিম দিকে উঠা ইত্যাদি) স্বচক্ষে দেখতে পাবে কেবল সেই সব মানুষ যারা পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে। সে সময় অবশ্য পৃথিবীতে কোন মু'মিন অবশিষ্ট থাকবে না। তারপর প্রচণ্ড বিস্ফোরণে পৃথিবী ফেটে ভেঙ্গেচুরে ধূলায় পরিণত হতে শুরু করবে। তাদের প্রত্যেকের নিজের কাম্য দীর্ঘ ভবিষ্যৎ জীবনের সকল আশা-আকাঙ্খা ও পরিকল্পনার এই আকস্মিক ও ভয়ঙ্কর অবসানের প্রক্রিয়া দেখে সকলেই ভীত, বিমূঢ় ও হতাশ হয়ে পড়বে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বিশ্বের সব কিছুর অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে। মহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ.

৫৫:২৬। (পৃথিবী ও) তার উপর যা কিছু আছে সবই বিলীন হয়ে যাবে,

وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ.

৫৫:২৭। অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি পরাক্রমশালী ও মহানুভব।

দ্রষ্টব্য : আল্লাহ্ তা'আলা নিজ সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় তাঁর সৃষ্ট প্রাণী ও জড়বস্তুসমূহের জন্য বিবিধ নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন। এ সকল নিয়মের সীমার মধ্যেই আমাদের সকল জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও আবিষ্কারের ফসল সীমাবদ্ধ; অর্থাৎ 'প্রকৃতির' নিয়মের বাইরে আর কোন নিয়ম সম্পর্কে আমাদের জানার তেমন কোন অবকাশ নেই। সেই আলোকেই ইতিপূর্বে আলোচিত বিষয় 'মৃত্যু' এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে 'মৃত্যু'তে প্রাণী বা বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন হয় মাত্র, একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। এ নিয়ম বর্তমান বিশ্বে আমাদের পরিলক্ষিত নিয়ম বটে।

কিন্তু সব কিছুর একমাত্র স্রষ্টা ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্‌র জন্য তাঁর ইচ্ছা বা সিদ্ধান্তই নিয়ম। সুতরাং বর্তমান বিশ্বের জন্য তিনি যে সকল নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন, তিনি যখন ইচ্ছা করবেন তখনই সে নিয়ম রহিত হয়ে যাবে, অর্থাৎ

তিনি যখন চাইবেন তখনই সৃষ্টির সবকিছু বিলীন বা নিঃশেষ করে দিবেন, তাঁর আপন সত্তা ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব তখন থাকবে না। এবং তিনিই তৎপর আবার তাঁর নূতন সৃষ্টিতে নূতন নিয়মসমূহের প্রবর্তন করবেন। সৃষ্টির জন্য তখন সেটাই হবে নিয়ম।

কিয়ামাতের প্রথম তথা ধ্বংস পর্বের পর শুরু হবে কিয়ামাতের দ্বিতীয় পর্ব, যখন আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করবেন নূতন ও বৃহৎ পরিসরের এক জগৎ, যা পূর্বাপর সকল মানুষ ও জ্বিন জাতির বাসোপযোগী হয়ে তৈরী হবে এবং যার এক অংশ হবে জান্নাত এবং অপর অংশ হবে জাহান্নাম। এই নূতন জগতের পরিসর ও পরিবেশ সম্বন্ধে কেবল আল্লাহ্ই জ্ঞাত, আমরা ততটুকুই জানতে পারি যা কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে। এই জগৎ প্রস্তুত হওয়ার পর ইস্রাফীল ফিরিশতা আল্লাহ্র নির্দেশে সিঙ্গায় দ্বিতীয় ধ্বনি দেবেন, আর প্রত্যেক মানুষ আবার তার দেহ, প্রাণ ও তার পূর্বের বোধশক্তি ফিরে পাবে। এখন আর শয়তানের কোন কুমন্ত্রণার প্রভাব তার উপর থাকবে না, ফলে মানুষের মিথ্যা বলা, সত্য গোপন করা কিংবা কোন প্রকার পাপ করার ক্ষমতাও থাকবে না, - তার বিবেক থাকবে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ। কিয়ামাতের এই দ্বিতীয় পর্বে সকলের কাজের হিসাব নেয়া তথা বিচার শুরু হবে। পাপীরা পৃথিবীতে যে পাপকে পাপ মনে করত না এখন তারা তাদের সে-সব পাপ ও দোষ বুঝবে ও অকপটে স্বীকার করবে।

সৃষ্টির সব কিছু ধ্বংস, নূতন জগৎ সৃষ্টি এবং পুনরুত্থান ও বিচার পর্বের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে একত্রে কিয়ামাত বলা হয়। কিয়ামাত এর সতর্কবাণী, কিয়ামাত কখন এবং কিভাবে শুরু হবে আর সৃষ্টির সকল বস্তুর কী পরিণতি হবে তার চিত্র কুরআনের নিম্নে উদ্ধৃত আয়াতসমূহে ফুটে উঠেছে।

কিয়ামাতের সতর্কবাণী

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ج اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيْمٌ.

২২:১। হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো (এবং তাঁর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন করো)। (কেননা) কিয়ামাত (শুরু) এর প্রকম্পন হবে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا

وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَاهُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ.

২২:২। যে দিন তা তোমরা প্রত্যক্ষ করবে, সে দিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী মাতা (মহা আতঙ্কে) তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে, আর প্রত্যেক গর্ভবতী নারী তার বোঝা ফেলে দেবে (গর্ভপাত করে ফেলবে); তুমি মানুষকে দেখবে যেন তারা নেশাগ্রস্ত মাতাল, যদিও তারা (প্রকৃত পক্ষে) নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র শাস্তি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لاَّ يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ز وَلاَ مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْئًا ط اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وقفه وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ.

৩১:৩৩। হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো এবং ভয় করো সেই দিনের, যে দিন কোন পিতা তার সন্তানের কোন উপকারে আসবে না, কিংবা সন্তানও তার পিতার কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ্‌র ওয়াদা অবশ্যই সত্য, সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং প্রধান প্রতারকও (শয়তান) যেন আল্লাহ্‌ সম্পর্কে তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করতে পারে।

وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ لا نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ط اَوَلَمْ تَكُوْنُوْآ اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَالَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ.

১৪:৪৪। আর (হে নবী!) মানুষকে সে দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দিন, যে দিন তাদের শাস্তি এসে যাবে এবং তখন যালিমরা (পাপীরা) বলবে, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দাও, আমরা (এবার) তোমার আহ্বানে সাড়া দেব এবং রাসূলগণকে অনুসরণ করব'। (জবাবে বলা হবে), কী! তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের কোন পতন নেই?

কিয়ামাত কবে ও কখন সংঘটিত হবে?

আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষের নিকট থেকে কিয়ামাতসহ অন্যান্য আরো অনেক বিষয়

সম্পর্কিত নির্দিষ্ট বা বিস্তারিত জ্ঞান গোপন রেখেছেন এই কারণে যে, সে জ্ঞান অর্জন করলেও মানুষের কোন উপকারে আসত না, বরং সে জ্ঞানের অপব্যবহার তাদের জন্য মারাত্মক ক্ষতি (বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বা বাস্তব পাপ ও ধ্বংসের মাধ্যমে) বয়ে নিয়ে আসত। তথাপি প্রত্যেক নবীই যেহেতু কিয়ামাত সম্পর্কে তাদের উম্মাহ্‌কে সতর্ক করেছেন, সেহেতু তাদের প্রত্যেকের উম্মাহ্‌র লোকজন কিয়ামাতের নির্দিষ্ট দিনক্ষণ সম্পর্কে জানতে চেয়েছে এবং অবিশ্বাসীরা তো সর্বদাই চ্যালেঞ্জ করেছে যে, সকল উম্মাহ্‌কেই তো কিয়ামাত 'শীঘ্রই আসবে' বলে সতর্ক করা হচ্ছে, তবে তা আসছে না কেন? কুরআন তাদের সবার উত্তর নীচের আয়াতসমূহের মাধ্যমে দিচ্ছে।

৭:১৮৭। (হে নবী!) তারা আপনাকে (কিয়ামাতের) সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, কখন তা সংঘটিত হবে। বলুন, এ সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আমার প্রতিপালকের কাছেই আছে; তিনি ছাড়া আর কেউই কখন তা সংঘটিত হবে তা প্রকাশ করতে পারবে না; তা হবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জন্য এক ভয়ঙ্কর ঘটনা। আকস্মিকভাবেই তা তোমাদের উপর আসবে। তারা এই ভেবে আপনাকে প্রশ্ন করে, যেন আপনি এ বিষয়ে সম্যক অবগত আছেন। বলে দিন, এ বিষয়ে জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (অনুরূপ আয়াত ২১:৩৮, ২১:৩৯, ৩১:৩৪, ৩৩:৬৩ ইত্যাদি)।

১৬:৭৭। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর গোপন বিষয়ের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই (আয়ত্তাধীন) এবং কিয়ামাত ঘটানোর ব্যাপার তো (তাঁর কাছে) চোখের পলকের ন্যায়, বরং তা থেকেও সত্বর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ের উপর শক্তিমান। (অনুরূপ ৫৪:৫০)।

৬:৭৩। তিনিই সত্য (নিয়ম-বিধি)-এর সাথে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; আর সে দিন (কিয়ামাত দিবসে) তিনি (কেবল) বলবেন, 'হও', তখনই (কিয়ামাত) হয়ে যাবে, তাঁর কথাই সত্য। যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিনকার রাজত্ব ও কর্তৃত্ব কেবল তাঁরই। অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবকিছু সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত এবং তিনিই প্রজ্ঞাময় ও সর্ববিদিত।

১৭:৫২। (এ হবে সেই দিন) যে দিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন আর তোমরা তাঁর প্রশংসার সাথে তাঁর আহ্বানে সাড়া দেবে এবং ভাববে তোমরা (ইহজগতে) অতি অল্প সময়ই কাটিয়ে এসেছ।

৩৬:৪৮। তারা (অবিশ্বাসীরা) বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বলো, (কিয়ামাতের) এই প্রতিশ্রুতি কবে (পূর্ণ) হবে?

৩৬:৪৯। তারা তো অপেক্ষায় আছে কেবল একটি মহাগর্জনের, যা তাদেরকে পাকড়াও করবে (হঠাৎ করেই), অথচ তারা (তখনও এব্যাপারে) বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত থাকবে।

৩৬:৫০। তখন তারা না পারবে শেষ ওসীয়তটুকু করতে, আর না পারবে তাদের পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে আসতে!

২৭:৮২। যখন তাদের উপর প্রতিশ্রুত (শাস্তির) সময় এসে পড়বে তখন আমি তাদের জন্য মাটির ভিতর থেকে এক (অদ্ভুত) জীব বের করে আনব, যা তাদের সাথে কথা বলবে, এজন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করতো না।

উপরের আয়াতসমূহ এবং আরো অনুরূপ অনেক আয়াতের মূল বাণী হচ্ছে, কিয়ামাত ঠিক কখন বা কোন বিশেষ যুগ থেকে ঠিক কতদিন পরে সংঘটিত হবে এটা মানুষের ভাবার বিষয় নয়। কেননা কিয়ামাতের পূর্বে যারা মরে যাবে তাদের জন্য এ জ্ঞান কোনই কাজে আসবে না। আর কিয়ামাত শুরুর দিন যারা জীবিত থাকবে তারাও হবে অবিশ্বাসী, যারা প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াদারী নিয়েই ব্যস্ত থাকবে এবং অকস্মাৎ যখন কিয়ামাত শুরু হয়েই যাবে তখন তাদেরও কিছুই করার থাকবে না।

মানুষের প্রকৃত কর্তব্য হলো কিয়ামাতের জন্য যথার্থ প্রস্তুতি নেয়া।

উম্মুল হাদীস খ্যাত হাদীসে জিব্রাঈল আ রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন, "..... আমাকে কিয়ামাত (এর সময়) সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল (সা) বললেন, 'এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তিনি জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা বেশী জানেন না।' ঐ ব্যক্তি (জিব্রাঈল) বললেন, 'তাহলে আমাকে (কিয়ামাত) এর আলামত সম্পর্কে বলুন।' রাসূল (সা) বললেন, '(তা হলো) দাসী আপন মুনিবকে প্রসব করবে; আর নগ্নপদ, বিবস্ত্রদেহ দরিদ্র মেষপালকদের বিরাট বিরাট অট্টালিকার (অধিকারী হওয়ার) প্রতিযোগিতায় গর্বিত দেখতে পাবে।' ..." মুসলিম-১। (মুসলিম-৫ এবং বুখারী-৪৮ অনুরূপ। পুরা হাদীস অনুচ্ছেদ ৪.১, প্যারা - ৪ এ -দেখুন)।

অন্য হাদীসে আছে, আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে জিজ্ঞেস করল, কিয়ামাত কবে হবে? রাসূল (সা) বললেন, এজন্য তুমি কি প্রস্তুত (আমল) করেছ? সে বলল, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা। তিনি (সা) বললেন, তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই থাকবে। (মুসলিম - ৬৩৭৮)।

কাফিরদের একটি সাধারণ প্রশ্ন এই যে, কিয়ামাত যদি আসন্নই তবে তা ঘটে যাচ্ছে না কেন? এর উত্তর হচ্ছে, কিয়ামাত একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বিলম্বিত বা স্থগিত হওয়ার আল্লাহ্র ঘোষণার (১১:১০৪) কারণ হলো, একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পৃথিবী বনী আদম দ্বারা আবাদ হতে থাকবে এটা মহান আল্লাহ্ পূর্ব হতেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। অবিশ্বাসীদের তাড়াহুড়া বা হঠকারিতাপূর্ণ চ্যালেঞ্জের কারণে সেই দিন এগিয়ে আসার কোনই সম্ভাবনা নেই।

তবে কিয়ামাতের সময় ঘনিয়ে আসার কিছু আলামত পৃথিবীতে প্রকাশ পেতে থাকবে এবং জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ঈমানদারগণ তা বুঝতে পারবেন। তার মধ্যে একটি হবে একটি ভয়ঙ্কর জীব এর আবির্ভাব, যার কথা উপরের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ হাদীসেও অনেকগুলি নিদর্শনের কথা বর্ণিত আছে, যেগুলির উপস্থিতি কিয়ামাত আসন্ন বলে ঈঙ্গিত দেবে। তবে 'আসন্ন' বা 'শীঘ্র' হচ্ছে আপেক্ষিক বিষয়; কেননা, হাজার হাজার বছর পূর্বের নবীরা যেমন কিয়ামাত আসন্ন বলেছেন তেমনি এখন থেকে যদি ধরে নেয়া যায় যে, আরো কয়েক হাজার বৎসর পরে কিয়ামাত ঘটবে, তথাপি এখনও এবং পরেও 'আসন্ন' কথাটির ব্যবহারে অর্থের আদৌ কোন তফাৎ হবে না। এর কারণ, আমরা একশত বৎসর বাঁচলেও ছোট বেলার কথা মনে হলে ভাবি, এই তো সেদিনের কথা; আবার মৃত্যুর পর (ঘুম বা সংজ্ঞাহীন অবস্থার মত) মানুষের স্মৃতি বা অনুভূতিতে সময়-জ্ঞান না থাকার কারণে কিয়ামাতের দিন মনে হবে, এই তো গতকাল মারা গেলাম! ফলে প্রকৃতপক্ষে হাজার হাজার বৎসরের সমান দৈর্ঘ্যের এবং ভয়াবহ অনিশ্চয়তার কিয়ামাত দিবসে পুনরুত্থানের পর প্রত্যেক মানুষের অতীতের অনুভূতি কেবল তার ইহকালীন কয়টি বৎসরের 'অল্প সময়ের' ব্যাপার হিসেবেই মনে হবে। সূরা কাহাফে বর্ণিত গুহাবাসীরা আল্লাহ্র ইচ্ছায় তিনশত বৎসর এক নাগাড়ে ঘুমিয়ে থেকে যখন সজাগ হলো, তখন তারাও মনে করেছিল অন্যান্য দিনের স্বাভাবিক ঘুমের মতই তারা হয়ত মাত্র কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়েছিল! এই হিসাবেই মানব জাতির প্রত্যেকের জন্যই কিয়ামাত অতি আসন্ন!

কিয়ামাতের লক্ষণ সম্পর্কিত কিছু হাদীস :

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন, কিয়ামাত প্রতিষ্ঠিত হবে না , ১. যতক্ষণ না দুই বড় দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয় যাতে উভয় পক্ষে অজস্র লোক হতাহত হয়, অথচ তারা হবে একই ধর্মীয় আদর্শের অনুসারী, ২. যতক্ষণ না অন্তত ত্রিশজন দাজ্জাল (মিথ্যুক) এর আবির্ভাব হবে এবং তাদের প্রত্যেকেই দাবী করবে যে সে আল্লাহ্‌র রাসূল, ৩. যতক্ষণ না (দ্বীনী) ইল্‌ম (আলিমগণের মৃত্যুর কারণে) উঠিয়ে নেয়া হবে, ৪. ভূমিকম্প বৃদ্ধি পাবে, ৫. সময় সংকুচিত হয়ে আসবে, ৬. দুঃখ-যাতনা বেড়ে যাবে, ৭. হত্যাকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে, ৮. যতক্ষণ না ধনসম্পদ এতটাই বেড়ে যাবে যে, একজন ধনী লোক এই আশংকায় থাকবে যে যদি কেউ তার যাকাত গ্রহণ না করে, আর যখন সে কাউকে যাকাত দেবে, তখন ঐ লোক বলবে, 'আমার এর প্রয়োজন নেই', ৯. যতক্ষণ না মানুষ উঁচু দালান তৈরীতে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে, ১০. যতক্ষণ না একজন লোক কোন ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলবে, 'আহ্, আমি যদি ওর জায়গায় হতাম!', ১১. এবং যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হয়। সুতরাং যখন সূর্য (পশ্চিম দিক থেকে) উদয় হবে এবং মানুষ তা দেখবে, তখন তারা সবাই ঈমান আনবে (ইসলাম গ্রহণ করবে), কিন্তু সেটা হবে ঐ সময়, যখন (আল্লাহ্‌র কথা অনুযায়ী) 'সেই সময় ঈমান আনায় তার কোন উপকার আসবে না যে লোক ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি অথবা ঈমান অনুযায়ী সৎকর্ম করে নি।' (কুরআন-৬:১৫৮) ...। সহীহ্ বুখারী - ৯.২৩৭।

অপর একটি হাদীসে আছে, হুযাইফা ইবনে উসায়েদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলছেন, 'কিয়ামাত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা দশটি নিদর্শন অবলোকন করবে। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া, ধোঁয়া উঠা, দাব্বাতুল আর্‌দের আবির্ভাব হওয়া, ইয়াজুয মাজুযের আত্মপ্রকাশ ঘটা, ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ) এর আগমন হওয়া, দাজ্জাল বের হওয়া, তিনটি ভূমিকম্প হওয়া ও যমীন ধ্বসে যাওয়া, - একটি পূর্ব দিকে, একটি পশ্চিম দিকে এবং একটি আরব উপদ্বীপে, আদনে এক আগুন প্রকাশিত হওয়া যার কারণে মানুষ দৌড়ে পালাতে থাকবে, তারা রাত্রে কোন যায়গায় ঘুমাতে চাইলে সেখানেও ঐ আগুন বিদ্যমান পাবে, আবার দিনে কোন স্থানে শুইতে চাইলে সেখানেও ঐ আগুন হাজির হইবে। (সহীহ্ মুসলিম - ১৩১২ এবং আহমাদ ও তিরমিযী)।

আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত আরো একটি হাদীসে আছে, সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হওয়া দেখে সমস্ত লোক ঈমান আনবে, কিন্তু ওটা এমন এক সময় যখন এমন ব্যক্তির ঈমান আনয়ন কোন উপকারে আসবে না যে ব্যক্তি এর পূর্বে ঈমান আনেনি। সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হওয়ার পূর্বে যারা তওবা করবে তাদের তওবা কবুল হবে, এর পর কারো তওবা কবুল হবে না। সহীহ্ বুখারী - ৬.১৫৯।

অন্যান্য হাদীসে আছে, ঐ রাত্রি দুই বা তিন রাত্রির সমান দীর্ঘ হবে।

সহীহ্ মুসলিমে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূল (সা) বলেছেন, "কিয়ামাত আসবে না যতক্ষণ না ফুরাত নদী স্বর্ণের একটি পাহাড় উন্মোচিত করে দেবে যার জন্য লোক মারামারি শুরু করবে। প্রতি একশত জনে নিরান্নব্বইজনই নিহত হবে, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই বলবে যে হয়ত সে-ই বেঁচে যাবে (এবং ঐ স্বর্ণের মালিক বনে যাবে)।" (মুসলিম - ৬৯১৮)

সহীহ্ বুখারীতে (২.৪৯৩, ২.৪৯৫) এও আছে যে, কিয়ামাতের পূর্বে ধন-দৌলতের আধিক্য ঘটবে, এমনকি যাকাতদানকারীরা যাকাতগ্রহণকারী খুঁজে পাবে না এবং পুরুষের তুলনায় নারীর আধিক্য এত বেশী হবে যে একজন পুরুষের ভরণপোষণে চল্লিশজন নারী আশ্রিতা হবে।

এ সম্পর্কে আরো অনেক সহীহ্ হাদীস আছে যা কিয়ামাতের লক্ষণ হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আভাস দিয়ে গেছেন। তন্মধ্যে দাসীর মুনিব প্রসব করা, অতীতে বিবস্ত্র লোকের বর্তমানে দালান নিয়ে গর্ব করা, আমানত নষ্ট করা তথা অনুপযুক্ত লোকের উপর দায়িত্ব অর্পিত হওয়া, ইল্ম লোপ পাওয়া, অজ্ঞতা, মদ্যপান, ব্যভিচার বৃদ্ধি পাওয়া, স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া, আল্লাহু আকবার বলার লোক না থাকা, ঈসা (আ) এর আগমন ইত্যাদি লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে।

দাজ্জাল : দাজ্জালের পরিচয় কি?

দাজ্জাল শব্দের অর্থ হচ্ছে, যে লোক প্রতারণার উদ্দেশ্যে সত্য এবং অসত্যকে মিশ্রিত করে, যাতে তার কথা শুনে লোক তার অনুগত ও অনুসারী হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন কিয়ামাতের পূর্বে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে, অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বদা দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাইতেন - তবে কি রাসূলুল্লাহ্‌ও (সা) সময়েই দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়ার সম্ভাবনা ছিল?

প্রকৃত পক্ষে দাজ্জাল সর্ব যুগে ছিল ও থাকবে - ধর্মহীন বস্তুতান্ত্রিক জগতের প্রতিভূ হিসেবে। প্রকৃত ব্যক্তি-দাজ্জাল কিয়ামাতের পূর্বে আবির্ভূত হবে দাজ্জালতন্ত্রের চূড়ান্ত নেতা হিসেবে। কিন্তু তার, তথা শয়তানের, প্রতিনিধিরা থাকবে যুগে যুগে। তারা ইহজাগতিক চোখ ঝলসানো, আকর্ষণীয় এবং লোভনীয় বিষয়াদি নিয়ে মানুষকে বস্তুজগতের দিকে আকর্ষণ করবে, যাতে মানুষ আল্লাহ্‌কে ভুলে যায়, পরকাল ভুলে যায় এবং ইহকালের দুর্নিবার আকর্ষণের পেছনে ছুটতে থাকে। আর মানুষকে আকর্ষণ করার জন্য দাজ্জালতন্ত্রের (ধর্মহীন বস্তুতান্ত্রিক ব্যবস্থার) হাতে যেমন থাকবে শক্তি ও ধনসম্পদের সীমাহীন প্রাচুর্য, তেমনি ঈমানদারদের বিভ্রান্ত করার জন্য তারা আবার ধর্মের এবং বিশ্বাসের কথাও তাদের কথার এবং আদর্শের মধ্যে জুড়ে দেবে। এই ফিতনা বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই হবে মানুষের জন্য অত্যন্ত কঠিন কাজ, কেননা অধিকাংশ মানুষ তাদের প্রতারণা বুঝতে সক্ষম হবে না। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার উম্মাতকে শিখানোর উদ্দেশ্যে বস্তুতান্ত্রিকতার চাকচিক্যময় জগতের অশুভ আকর্ষণ থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাইতেন।

তাই দাজ্জালের প্রকৃত সত্তা দুটি, - একটি হচ্ছে ঈমান বিবর্জিত বস্তুতান্ত্রিক আদর্শের, যা শুধু ইহজগতের দিকে মানুষকে প্রলুব্ধ করে রাখে (এক চোখা), পরজগতের কথা এর অভিধানে নেই; আরেকটি হচ্ছে প্রকৃত ব্যক্তি-দাজ্জাল, যে কিয়ামাতের পূর্বে চূড়ান্তভাবে আবির্ভূত হবে এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করবে।

ব্যক্তি-দাজ্জালকে আল্লাহ তা'আলা অনেক অলৌকিক ক্ষমতা দেবেন, বিশেষত মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। তার একাধিক অলৌকিক শক্তি দৃষ্টে ও প্রতারণামূলক কথা শোনে অধিকাংশ লোক তাকে বন্ধু হিসেবে ভুল করবে এবং নেতা হিসেবে মেনে নেবে; সে যে প্রকৃতপক্ষে মানবতার শত্রু তা বুঝা প্রায় অসম্ভব হবে। **এ জন্য বলা হয়, মানব সৃষ্টির পর থেকে কিয়ামাতের পূর্ব পর্যন্ত মানব জাতির জন্য সব চাইতে কঠিন ও ভয়ংকরতম ফিৎনা (বিপর্যয় ও পরীক্ষা) হচ্ছে দাজ্জালের আবির্ভাব।**

দাজ্জালকে ঈমানদারগণ যাতে সহজে চিনতে পারেন সে জন্য তার ক্ষমতা, বিবিধ কর্মকাণ্ড ও দৈহিক পরিচিতি সম্পর্কে রাসূল (সা) পূর্বাভাস দিয়ে গেছেন। বহু বিশুদ্ধ হাদীসে তার এ সব পরিচিতি বর্ণিত হয়েছে। তাই প্রকৃত ঈমানদারগণ তাকে হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে চিনে ফেলবেন; আর কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের লোকেরা তার অনুসারী হয়ে যাবে।

দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে, সে নিজেকে স্রষ্টা দাবী করত সকলকে তার উপাসনা করতে বলবে। আল্লাহ্ তাকে যে সকল অলৌকিক ক্ষমতা দিবেন তার মধ্যে আছে, মৃতকে জীবিত করা, বৃষ্টিপাত ঘটানো, অনুর্বর জমিতে ফসল জন্মানো, পৃথিবীর ধনভাণ্ডার আহরণ করা ইত্যাদি। সে হবে একজন সুঠাম দেহী খাটো আকৃতির প্রশস্ত কপাল বিশিষ্ট এক চোখ কানা তরুণ এবং তার কপালে কাফির লিখা থাকবে। পারস্যের খোরাসান থেকে সে যাত্রা শুরু করবে। ইস্পাহানের ইহুদীরাই (সংখ্যায় ৭০ হাজার) হবে তার প্রথম অনুসারী এবং এরাই হবে তার অনুসারীদের অধিকাংশ। অলৌকিক ক্ষমতা ও শক্তির বলে সে মানুষকে বিপথগামী করতে থাকবে। তার কোন সন্তানাদি হবে না। তার সঙ্গে একটি জান্নাত ও একটি জাহান্নামও থাকবে বলে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেই জান্নাত হবে আসলে জাহান্নাম এবং তার জাহান্নাম হবে আসলে জান্নাত। তার চলার গতি মেঘের মত দ্রুত হবে। যারা তার উপর বিশ্বাস আনবে তাদের জন্য সে খেত খামারের প্রাচুর্য বইয়ে দেবে, যারা তার অনুসারী হবে না তাদের দুর্ভিক্ষের মোকাবিলায় পড়তে হবে। তার মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা দেখে অনেকেই তাকে স্রষ্টা বলে স্বীকার করে নেবে। এসব কারণে রাসূল (সা) নিজে সর্বদা দাজ্জালের পরীক্ষা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন এবং উম্মাহকেও বলেছেন সালাতে তাশাহ্হুদের পর যেন তারা অন্যান্য ফিতনার সাথে দাজ্জালের ফিতনা থেকে সর্বদা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। দাজ্জাল সম্পর্কিত তিনটি হাদীস নীচে বর্ণিত হলো :

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, "একদিন রাসূল (সা) আমাদের কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে একটি দীর্ঘ বর্ণনা শুনালেন, তাঁর বর্ণিত বিষয়গুলির মধ্যে ছিল, দাজ্জাল আসবে, কিন্তু মদীনার পাহাড়ী প্রবেশপথগুলো দিয়ে আসা তার জন্য নিষিদ্ধ থাকবে। মদীনার পার্শ্ববর্তী একটি লবনাক্ত অঞ্চলে সে তাঁবু খাটাবে এবং তার নিকট একজন লোক হাজির হবে যে হবে সর্বোত্তম ব্যক্তি অথবা সর্বোত্তমদের একজন। সে বলবে, তুমি হচ্ছ দাজ্জাল, যার কথা আল্লাহ্র রাসূল আমাদেরকে বলে গেছেন।' দাজ্জাল (তার অনুসারীদেরকে) বলবে, 'লক্ষ্য করো, যদি আমি এই লোককে মেরে ফেলি এবং তৎপর তাকে জীবিত করি তবে কি তোমরা আমার (আল্লাহ্ হওয়ার) দাবী সম্বন্ধে কোন সন্দেহ পোষণ করবে?' তারা উত্তর দেবে, 'না'। তখন দাজ্জাল লোকটিকে হত্যা করবে এবং তারপর তাকে জীবিত করবে। লোকটি তখন বলবে, 'আল্লাহর শপথ, এখন তো আমি তোমাকে আগের চাইতে আরো নিশ্চিত ভাবে চিনতে পারছি।' দাজ্জাল তখন তাকে

(আবার) হত্যা করতে চেষ্টা করবে, কিন্তু তা করতে তাকে আর ক্ষমতা দেয়া হবে না।" (বুখারী- ৯.২৪৬)।

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, "এমন কোন রাসূল প্রেরিত হন নি যার অনুসারীদেরকে তিনি একচক্ষু বিশিষ্ট মিথ্যাবাদী (দাজ্জাল) সম্পর্কে সতর্ক করেননি। সাবধান! তার এক চোখ কানা, আর তোমাদের রব তা নন; এবং তার (দাজ্জালের) দুই চোখের মাঝখানে (কপালে) লিখা থাকবে 'কাফির'।" বুখারী- ৯.২৪৫। (এই হাদীসটি আবু হুরাইরা (রা) ও ইব্ন আব্বাস (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে)

আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, "মসীহ্ আদ্-দাজ্জাল কর্তৃক সৃষ্ট আতঙ্ক মদীনায় প্রবেশ করবে না এবং এসময় মদীনায় (প্রবেশের) সাতটি প্রবেশ পথ থাকবে এবং প্রত্যেক প্রবেশ পথে (পাহারা দিতে) দু'জন করে ফিরিশতা থাকবেন (ফলে দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না)।" বুখারী- ৯.২৪০।

দাজ্জালের আবির্ভাব কিয়ামাতের পূর্বে ঘটলেও পৃথিবীতে তার উপস্থিতি ঘটে গেছে বলে তামিম দারীর বর্ণিত ঘটনা সম্পর্কিত বিখ্যাত হাদীস থেকে জানা যায়। সহীহ্ মুসলিমে উদ্ধৃত সুদীর্ঘ হাদীসটির সারসংক্ষেপ হচ্ছে :

ফাতিমা বিনতে কাইস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ...রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, ...তামীম দারী, যে খৃষ্টান ছিল, সে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং এমন কিছু বলেছে যা দাজ্জাল সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে যা বলে ছিলাম তার সঙ্গে মিলে যায়। সে (তামীম দারী) সমুদ্র পথে যাত্রার সময় সঙ্গীগণসহ ঝড়ের কবলে পড়ে এক দ্বীপে আশ্রয় নেয়। সেখানে আল জাস্সাস নামের এক অদ্ভুত প্রাণীর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হলে প্রাণীটির পরামর্শে তারা নিকটবর্তী এক গির্জায় তাদের জন্য অপেক্ষমান এক লোকের সাথে দেখা করতে যায়। সেখানে গিয়ে তারা একটি সুঠাম দেহের লোককে হাত পা লোহার বেড়ী দিয়ে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পায় এবং তার পরিচয় জিজ্ঞেস করে। লোকটি তাদেরকে মদীনার খেজুর গাছের ফলন, বিভিন্ন জলাধারের পানি ইত্যাদির অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত বলল, 'বল তো নিরক্ষর নবীর খবর কি? তিনি কি করছেন?' তারা বলল, তিনি মক্কা থেকে মদীনায় এসে অবস্থান করছেন এবং মদীনার চতুর্পাশের লোক তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করছে। এতে সে বলল, 'সত্যিই কি এমনটি ঘটেছে?' তারা বলল, হ্যাঁ। তখন সে বলল, 'তাহলে আমি আমার পরিচয় দিচ্ছি। আমি হচ্ছি

দাজ্জাল এবং শীঘ্রই আমাকে বের হয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। আমি বের হয়ে কেবল মক্কা ও মদীনা ছাড়া সকল শহরে প্রবেশ করব এবং কাউকে ছাড়বো না। কেননা এই দুই শহর ফিরিশতারা পাহারা দেবেন।' রাসূল (সা) অতপর বলেন, সে অবশ্যই পূর্ব দিক থেকে আবির্ভূত হবে।" (মুসলিম - ৭০২৮ এর সার সংক্ষেপ)।

ইয়াজুজ ও মাজুজ এর পরিচয় :

এদের সম্পর্কে সূরা কাহাফে (১৮:৯৩ ~ ১৮:৯৯ আয়াত) বর্ণনা রয়েছে যে এরা মানব গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু এদের প্রধান কাজই হচ্ছে পৃথিবীতে শান্তি প্রিয় মানুষের মধ্যে ত্রাস ও অশান্তির সৃষ্টি করা এবং মানুষের জীবিকা খেয়ে ধ্বংস ও শেষ করে দেয়া। এরা সংখ্যায় অত্যধিক এবং তাদের ফ্যাসাদ সৃষ্টির কারণে তাদেরকে মানুষের জনবসতির পিছনে পাহাড়ের আড়ালে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। যে দুইটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান দিয়ে তারা বের হয়ে আসত সেই ফাঁকা স্থানটি আল্লাহ্র ইচ্ছায় মহাবীর জুল-কারনাইন গলিত লৌহস্তুপ দিয়ে বন্ধ করে দেন এবং মানব জাতি কিয়ামাতের পূর্ব পর্যন্ত তাদের থেকে রক্ষা পায়। তাদের সম্ভাব্য স্থান হচ্ছে মধ্য এশিয়া বা বৃহত্তর তুর্কী অঞ্চল (আল্লাহ্ই ভাল জানেন)। কিয়ামাতের নিকটবর্তী সময়ে তারা লৌহস্তুপের প্রাচীর ভেদ করে বেরিয়ে আসবে এবং তাদের ধ্বংসাত্মক কাজ শুরু করবে। এই ঘটনা দাজ্জালের আগমনের পর ঘটবে। তাদের মুক্তির কথা আয়াত ২১:৯৬ তে বলা হয়েছে। এই আয়াতের তাফসীরে সুদীর্ঘ কয়েকটি হাদীস আছে, যার মধ্যে একটিতে বলা হয়েছে, ঈসা (আ) দাজ্জালের সময় পৃথিবীতে অবতরণ করত তাকে হত্যা করবেন। এসময় ইয়াজুজ ও মাজুজদের উপদ্রব ও ধ্বংস থেকে রেহাই দেবার জন্য তিনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করবেন এবং তারা মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা পড়বে। এরা আল্লাহ্র অবাধ্য হওয়ার কারণে জাহান্নামী হবে এবং তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণেই কিয়ামাতের দিন মানব জাতির প্রতি ১০০০ জনের মধ্যে ৯৯৯ জনই জাহান্নামে যাবে বলে সহীহ্ হাদীসে (বুখারী-৪.৫৬৭, ৬.২৬৫ ইত্যাদি) বর্ণিত হয়েছে। এরা মারা যাবার পর পৃথিবীতে কিছু কালের (সাত বৎসর) জন্য শান্তি ও ফল-ফসলের প্রাচুর্য ফিরে আসবে, অতপর আল্লাহ্র ইচ্ছায় একটি পবিত্র, উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হবে যার ফলে সকল ঈমানদার লোক মৃত্যু বরণ করবে এবং অতি-আসন্ন কিয়ামাত পর্যন্ত কেবল কাফিররাই বেঁচে থাকবে।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের কাছে যেহেতু ভূপৃষ্ঠের সকল অঞ্চলই দৃশ্যমান, তাই প্রশ্ন উঠতে পারে যে তাহলে ইয়াজুজ মাজুজরা কোথায়? এর উত্তরে এটাই বলা যায় যে একমাত্র স্রষ্টা ও রিযিক দাতা আল্লাহ্ই তাদেরকে ভূপৃষ্ঠের নীচে (বা এমনকি ভূপৃষ্ঠের উপরে অজানা স্থানে) কোথাও আবাস ও রিয্ক দিয়ে রেখেছেন যা মানুষের অনাবিষ্কৃত ও দৃষ্টির অন্তরালে রয়ে গেছে। সুতরাং এদের অস্তিত্বে সন্দেহ বা অবিশ্বাস করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। এ ছাড়া কোন কিছুর মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে বা অনাবিষ্কৃত থাকা তো সেটির অস্তিত্বহীনতার যুক্তি বা প্রমাণ নয়। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এদের চোখ হবে ছোট আকৃতির অর্থাৎ সম্ভবত এরা মঙ্গোলীয় জাতের।

দাব্বাতুল আর্দ বা ভূ-গর্ভ হতে উত্থিত জন্তু :

আয়াত ২৭:৮২ তে দাব্বাতুল আর্দ এর বর্ণনা দেয়া আছে। এর আকৃতি ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে একাধিক 'আসার' তথা সাহাবাগণের (রা) বর্ণনা আছে এবং বর্ণনাগুলির মধ্যে অনেক ভিন্নতা আছে। আয়াত ২৭:৮২ এর তাফসীরে ইবনে কাসীর বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)র বর্ণনায়, এটি একটি চতুষ্পদ জন্তু, দীর্ঘ দেহী ও অতি দ্রুতগতির হবে। জন্তুটি মানুষের সাথে কথা বলবে এবং মু'মিন ও কাফিরকে চিহ্নিত করে দেবে।

কিয়ামাত যেভাবে শুরু হবে এবং সৃষ্টির পরিণতি

মানব জাতির জন্য সবচাইতে ভয়ঙ্কর দিন এর প্রথম বা ধ্বংস পর্ব শুরু হবে আল্লাহ্র আদেশে ইস্রাফীল ফিরিশতা কর্তৃক সিঙ্গাতে প্রথম ফুঁক দেয়া থেকে সৃষ্ট গগনবিদারী দীর্ঘস্থায়ী আওয়াজের মাধ্যমে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের বর্ণনা থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, এই মহা নিনাদের ফল হিসেবে নিম্নোক্ত ঘটনাবলী ঘটতে থাকবে :

ইস্রাফীল (আ)-এর সিঙ্গার ভয়াবহ শব্দ বিশ্বের সকল নক্ষত্রপুঞ্জ ও তার মধ্যকার সকল গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে যে কম্পন সৃষ্টি করবে তাতে এ-সবের মধ্যকার পারস্পরিক আকর্ষণ ও অবস্থানের সূক্ষ্ম ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে, অথবা এ ভারসাম্য প্রথমে কোন এক যায়গায় নষ্ট হয়ে তার পর তার প্রভাব সর্বত্র পড়বে এবং সকল গ্রহ-নক্ষত্র ও নক্ষত্রপুঞ্জ তাদের নিজ নিজ নির্দিষ্ট গতিপথ হারিয়ে এমন এক অরাজকতার মধ্যে পতিত হবে যে, অপেক্ষাকৃত ছোট বস্তু তদপেক্ষা

বড় বস্তুর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে ধ্বংস হতে থাকবে। এ অবস্থা চলতে চলতে এক সময় এমন হবে যে বিশ্বে কিছুরই পৃথক কোন অস্তিত্ব থাকবে না, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে এবং 'জ্বলে পুড়ে' সবকিছু সম্ভবতঃ প্রথমে বায়বীয় অবস্থায় পরিণত হয়ে পরে এক মহা-সংকোচন প্রক্রিয়ায় পতিত হবে। এমতাবস্থায় বিশ্বের সবকিছু এক মহা-সংকোচিত বিন্দু অথবা এক মহা 'ব্ল্যাক হোল' তথা অন্ধকার গর্তে পরিণত হবে। মহা 'ব্ল্যাক হোল' এর সংকোচন প্রক্রিয়ারও এক সীমা থাকবে এবং সেই সীমায় তথা মহা-সংকোচিত বিন্দুতে পৌঁছে মহা বিশ্বের সকল পুঞ্জীভূত শক্তি এক বিস্ফোরণোন্মুখ অবস্থার সম্মুখীন হবে। এক সময় সংকোচিত মহাবিশ্ব আবার বিস্ফোরিত হবে সৃষ্টির আদি বিস্ফোরণ বা 'বিগ-ব্যাং'-এর মত, এবং শুরু হবে নূতন জগতের সৃষ্টি প্রক্রিয়া। ('বিগ ব্যাং' সম্পর্কে পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

তবে মহাবিশ্বের এই মহা বিপর্যয় সম্পর্কে মানুষের পক্ষে এরকম কিছু অনুমান করা ছাড়া দেখার বা অনুভব করার কোন অবকাশ নেই এবং সে প্রশ্নই আসে না। সীমাহীন বিশ্বের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গোলক এই পৃথিবীর শেষ বাসিন্দাদের অনেকে অবশ্য পৃথিবী ও এর নিকটতম দুটি দৃশ্যমান বস্তু তথা চন্দ্র ও সূর্যের পরিণতির একেবারে প্রাথমিক পর্যায় দেখার কিছু সুযোগ পাবে। যখন আমাদের এ সৌরজগতের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপর্যয় ঘটবে এবং পৃথিবীর স্বাভাবিক ঘুর্ণন ব্যাহত হবে তখন পৃথিবী উল্টো দিকে আবর্তিত হতে থাকবে, অথবা পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য প্রত্যেকেই কক্ষচ্যূত হয়ে পড়বে, যার ফলে পৃথিবীর শেষ বাসিন্দাদের কাছে প্রতীয়মান হবে যে, সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হচ্ছে! এসময় কিছুক্ষণের জন্য চন্দ্র-সূর্য-পৃথিবী এক সরল রেখায় অবস্থান করবে, যখন চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণ দৃশ্যমান হবে। চন্দ্রের গ্রহণের কারণে আলো ধীরে ধীরে কমে যাবে, অথবা সূর্যের নিজস্ব ধ্বংস প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাওয়ায় সৌরজগতের সব কিছুই অন্ধকারে পতিত হতে থাকবে, এবং চন্দ্রও নিস্প্রভ হয়ে যাবে। অবশেষে চন্দ্র এক সময় সূর্যের মধ্যে পড়ে বিলীন হয়ে যাবে এবং পৃথিবীও একটি অতিকায় বোমার মত বিস্ফোরিত হয়ে ধূলায় পরিণত হবে।

কুরআন ও হাদীসের ভাষায় পৃথিবীর দৃশ্য :

হাদীসে আছে, শিঙ্গায় প্রথম আওয়াজে পৃথিবীর সকল মানুষ ভয়বিহ্বল ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে, কেবল তারা ছাড়া, যাদেরকে (শহীদগণকে) আল্লাহ্ স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবেন (নীচে ২৭:৮৭ দ্রঃ)। সেদিন মায়েরা দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরকে ভুলে যাবে, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হয়ে যাবে, ভয়ে অল্প

বয়স্কদের বার্ধক্য এসে যাবে। মানুষ কোথাও আশ্রয় পাবে না, আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখবে গ্রহ-নক্ষত্র টুকরো টুকরো হয়ে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। মৃতরা এসবের কিছু টের পাবে না, তবে শহীদগণকে (যেহেতু তারা মৃত নন) আল্লাহ হতবুদ্ধি ও আতঙ্কিত হওয়া থেকে মুক্ত রাখবেন। দীর্ঘদিন এই অবস্থা চলার পর আল্লাহ্‌র আদেশে ইস্রাফীল (আ) শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকার দেবেন এবং এর ফলে সকল মানুষ ও প্রাণী সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে অবশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। আর এদের দেহ বিস্ফোরিত পৃথিবীর আর সকল উপাদানের সাথে মিশে একাকার হয়ে যাবে।

তার পর আল্লাহ্‌র আদেশে সৃষ্ট হবে নূতন পৃথিবী ও তার চার পাশে আরেক নূতন বিশ্ব। এবং এই নূতন সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় যে সময় অতিবাহিত হবে তা মানুষের পরিমাপে হবে হাজার হাজার বৎসর, অথচ মৃত অবস্থায় থাকার কারণে সমগ্র মানব কুলের কেউই এই সুদীর্ঘ সময়ের পরিমাপ ও সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পরিবর্তন সম্বন্ধে তেমন কিছুই টের পাবে না। এর পরই ইস্রাফীল (আ) এর তৃতীয় বার শিঙ্গায় আওয়াজ দেয়ার সাথে সাথে প্রত্যেক মানুষ তার পূর্বের শরীর ও প্রাণ ফেরত পাবে এবং দেখতে পাবে যে, পৃথিবীতে কৃত তার সকল কর্মের জবাবদিহীতা করতে সে তার স্রষ্টার সম্মুখে বিবস্ত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, আর তার বুকে ঝুলে আছে নিজের আমলনামা তথা কর্মের সকল হিসাব!

২৭:৮৭। আর যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সকলেই ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে, কেবল তারা ব্যতীত, যাদেরকে আল্লাহ্ চাইবেন (এ থেকে রক্ষা করতে); আর (সেদিন) সকলেই তাঁর নিকট আসবে বিনীত অবস্থায়।

২৭:৮৮। আর পর্বতমালাকে দেখছ (এবং) মনে করছ তা অনড়, অথচ (কিয়ামাতের দিন) তারা মেঘপুঞ্জের মত উড়তে থাকবে। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির শৈল্পিক নৈপুণ্য, যিনি সব কিছুকে সুষম করে রেখেছেন। তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে তিনি অবশ্যই সম্যক অবগত আছেন।

৬৯:১৪। (সেদিন) পর্বতমালা সমেত পৃথিবী ছিটকে পড়বে এবং একটি মাত্র ধাক্কায় তারা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে।

৬৯:১৫। সেদিনই সংঘটিত হবে (সেই) মহা প্রলয়,

৬৯:১৬। এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, আর সে দিন তাদের (আকাশের সব কিছুর) বাঁধন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।

(পর্বতমালার অবস্থা সম্পর্কিত অন্যান্য অনুরূপ আয়াত : ১৮:৪৭, ২০:১০৫-১০৭, ৭৮:২০, ১০১:৫ ইত্যাদি)

৭৫:৬। মানুষ প্রশ্ন করে, কখন (প্রতিশ্রুত) কিয়ামাত দিবস আসবে?

৭৫:৭। (বলো), যখন সকলের দৃষ্টি শক্তি স্থবির হয়ে যাবে,

৭৫:৮। এবং চন্দ্র হয়ে পড়বে নিষ্প্রভ,

৭৫:৯। আর সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে -

৭৫:১০। সেদিন মানুষ বলবে, আজ পালাবার স্থান কোথায়?

৭৫:১১। না, কোথাও কোন আশ্রয়স্থল নেই!

৭৫:১২। সেদিন ঠাঁই হবে (কেবল) তোমার প্রতিপালকের নিকট,

৭৫:১৩। সেদিন প্রতিটি মানুষকে জানিয়ে দেয়া হবে সে কী কাজ অগ্রে পাঠিয়েছে (পালন করেছে) এবং কী পশ্চাতে ফেলে এসেছে (পালন করেনি)।

৭০:৬। অবিশ্বাসীরা সেই দিনকে বহু দূরের ব্যাপার (হিসাবে) দেখে,

৭০:৭। কিন্তু *আমরা* (আল্লাহ্ তা'আলা) দেখি তা আসন্ন।

৭০:৮। সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মত,

৭০:৯। আর পর্বতসমূহ হবে (রং বেরং এর) ধুনা পশমের মত,

৭০:১০। আর কোন বন্ধু তার বন্ধুর খবর নিবে না, -

৭০:১১। যদিও তাদেরকে একে অপরের দৃষ্টির মধ্যে রাখা হবে। অপরাধী সেদিনের শাস্তি থেকে নিজেকে বাঁচাতে (মুক্তিপণ হিসেবে) তার সন্তান সন্ততিকে দিতে (পারলে তাও করতে) চাইবে;

৭০:১২। (দিতে চাইবে) নিজের স্ত্রী ও ভাইকে;

৭০:১৩। তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠিকে, যারা তাকে আশ্রয় দিয়েছিল;

৭০:১৪। এবং পৃথিবীর সবকিছু, যাতে তা (মুক্তিপণ হিসেবে) তাকে মুক্তি দেয়। (অনুরূপ আরো আয়াত ৭৭:৭ - ৭৭:১৩, ২৫:২৫ - ২৫:৩১ ইত্যাদি)

২১:১০৪। (সেই দিনের কথা স্মরণ কর) যে দিন আমি আকাশকে গুটিয়ে

ফেলব, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর (যেমন দলীল, ফরমান ইত্যাদি); যেভাবে *আমরা* সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবেই পুনরায় *আমরা* সৃষ্টি করব; (এ একটি) প্রতিশ্রুতি (যা) পালন করা *আমাদের* উপর কর্তব্য, *আমরা* এ কর্তব্য পালন করব।

৩৯:৬৭। (মূর্খ পৌত্তলিক) লোকগুলো আল্লাহ্ তা'আলার মূল্যায়ন সেভাবে করেনি যেভাবে মূল্যায়ন তাঁর প্রাপ্য; কিয়ামাতের দিন গোটা পৃথিবীই থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে (অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব থাকবে একমাত্র তাঁরই আয়ত্ব ও কর্তৃত্বে); পবিত্র ও মহান তিনি, ওরা (মুশরিকরা) যা কিছু (তাঁর সাথে) শরীক করে তা থেকে তিনি উর্ধ্বে।

৩৯:৬৮। আর শিঙ্গায় (দ্বিতীয়) ফুৎকার দেয়া হবে, ফলে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে, কেবল তারা ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ্ (এ অবস্থা থেকে মুক্ত রাখতে) চান; তৎপর আবার শিঙ্গায় (তৃতীয়) ফুৎকার দেয়া হবে, তখন তারা সকলে দণ্ডায়মান হয়ে (ভয় ও বিস্ময়ে) তাকাতে থাকবে।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'আল্লাহ্ যমীনকে কব্জা করে নিবেন এবং আকাশকে দক্ষিণ হস্তে মুষ্টিবদ্ধ করবেন। অতঃপর বলবেন, 'আমিই বাদশাহ। যমীনের বাদশাহ্রা কোথায়?' (সহীহ্ বুখারী - ৬.৩৩৬, মুসলিম - ৬৭০৩)।

উপরের হাদীস এবং ২১:১০৪ ও ৩৯:৬৭ আয়াতদ্বয় (এবং অন্যান্য আয়াত) কিয়ামাত দিবসে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার একচ্ছত্র ক্ষমতার কথা ঘোষণা করে। আয়াত দুটি সম্ভবত কিয়ামাত দিবসে মহাবিশ্বের মহা সংকোচনেরও ইঙ্গিত বহন করে (পরিশিষ্টে বিগ ব্যাং সূত্র দ্রঃ)।

তৃতীয় অধ্যায়

কিয়ামাতের দ্বিতীয় পর্ব - পুনরুত্থান ও বিচার

৩.১। কিয়ামাত দিবসের দৈর্ঘ্য ও সময়ের আপেক্ষিকতা সম্পর্কিত ধারণা

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে (এবং সম্ভবতঃ অন্যান্য জীবকেও) সময় সম্পর্কিত একটি অনুভূতি দিয়েছেন, যার দ্বারা মানুষ সময়ের পরিমাপ করতে পারে এবং সে-অনুযায়ী নিজের সকল কাজকর্মকে একটি নিয়মের ও শৃঙ্খলার আওতাভুক্ত করতে পারে। মানুষের অনুভূতিতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ - এই তিনটি নির্দিষ্ট কাল বা সময় সীমা চিহ্নিত হয়ে আছে। ভবিষ্যৎ মানুষের জন্য সম্পূর্ণই অজানা, অতীতের কেবল এতটুকুই মানুষ জানে যা অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানলব্ধ, আর বর্তমানই কেবল তার চলমান জানা অধ্যায়, যা অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন।

সময়কে দিন, মাস, বৎসর ইত্যাদি পরিমাপের মান দিয়ে মাপা হলেও, সময়ের অনুভূতি কেবল মানুষের সজ্ঞান অবস্থায় থাকে। ফলে সময়ের অনুভূতি প্রকৃত পক্ষে একটি আপেক্ষিক বিষয়। কিয়ামাত 'আসন্ন' বা নিকটবর্তী এই কথার ব্যাখ্যায় তা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। আসহাব-এ-কাহাফ (সূরা কাহাফ দ্রঃ) বা গুহাবাসীরা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তিনশত বৎসর এক নাগাড়ে ঘুমিয়ে থেকে যখন সজাগ হলো, তখন তারা মনে করেছিল অন্যান্য দিনের স্বাভাবিক ঘুমের মতই তারা হয়ত মাত্র কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়েছিল! কিয়ামাত দিবসে একই অনুভূতি হবে মানুষের, অথচ মৃত্যুর পর থেকে মানুষ হাজার হাজার বৎসর 'কবরে শায়িত' তথা আলম-এ-বারযাখ এ থাকবে। মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার মধ্যকার এই সময়টুকুর অনুভূতি মানুষের থাকবে না। এমন কি কিয়ামাতের শুরু বা ধ্বংস পর্বের সময় পৃথিবীর শেষ বাসিন্দারা পৃথিবীর ধ্বংস প্রত্যক্ষ বা অনুভব করা সত্ত্বেও তাদের কাছেও সেই ধ্বংস পর্ব ও পুনরুত্থান পর্ব একই দিনে একটি

চলমান ঘটনা হিসেবে সংঘটিত হয়েছে বলে মনে হবে! অর্থাৎ কিয়ামাতের দুই পর্বের মধ্যখানের সময় সম্পর্কে মানুষের কোন ধারণা না থাকার কারণে বাস্তবে কিয়ামাত সকল মানুষের কাছে একই ঘটনার দিন হিসাবে মনে হবে। তথাপি আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে এই 'দিবসের' দৈর্ঘ্য সম্পর্কে কুরআনে কিছু আভাস দিয়েছেন।

৭০:৪। ফিরিশতাকুল ও রূহ আল্লাহ্‌র দিকে ঊর্ধগামী হয় এমন এক দিনে (কিয়ামাতের দিনে) যার পরিমাণ (পার্থিব হিসাবে) পঞ্চাশ হাজার বৎসর।

৩২:৫। তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, অবশেষে সবকিছুই একদিন তাঁর সমীপে সমুত্থিত হবে (বিচারের সম্মুখীন হতে), যে দিনের পরিমাপ হবে তোমাদের (পার্থিব) হিসাবে এক হাজার বৎসর। অনুরূপ - ২২:৪৭।

উপরের ৭০:৪ নং আয়াত থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে বর্তমান বিশ্বের ধ্বংস এবং নতুন বিশ্বের জন্ম ও বিচার দিবসের প্রস্তুতির মাঝখানের তথা শিঙ্গার দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময় আমাদের হিসাবে পঞ্চাশ হাজার বছর। অনুরূপভাবে ৩২:৫ নং আয়াত থেকে অনুমান করা যেতে পারে, বিচার দিবস তথা যে দিন সকলকে আল্লাহ্‌র সামনে পুনরুত্থিত করা হবে এবং বিচার করা হবে তার দৈর্ঘ্য আমাদের হিসাবে এক হাজার বছর।

তাফসীর ইবনে কাসীরে (৮৩:৬ আয়াতের ব্যাখ্যায়) উল্লেখ করা হয়েছে, শেষ বিচারের দিন মানুষের কিয়ামাত বা দাঁড়িয়ে থাকার সময়ের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে একাধিক হাদীস আছে। ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, চল্লিশ বছর পর্যন্ত মানুষ আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। কেউ কোন কথা বলবে না। পাপী পুণ্যবান সবাইকে ঘামের লাগাম ঘিরে রাখবে। এক হাদীসে আছে মানুষ সত্তর বছর ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে, অন্যান্য হাদীসে চল্লিশ, একশত এবং তিনশত বৎসর বলা হয়েছে। আবার এও বলা হয়েছে মানুষ চল্লিশ হাজার বৎসর দাঁড়িয়ে থাকবে এবং দশ হাজার বছর ধরে বিচার করা হবে। ইবনে উমার (রা) বলেন যে, তারা একশত বৎসর দাঁড়িয়ে থাকবে। তাদের কেউ কেউ তার ঘামে নিজের কর্ণদ্বয়ের অর্ধেক পর্যন্ত ডুবে যাবে। (অন্যান্য বর্ণনায় আছে, পাপের পরিমাণ অনুযায়ী কারো গোড়ালী পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত এবং কারো কোমর পর্যন্ত, এমনকি নাক পর্যন্ত ডুবে যাবে)।

সহীহ্ মুসলিমে ২১৬১ নং হাদীসে উল্লেখ আছে, রাসূল (সা) বলেছেন, কিয়ামাত দিবসের দৈর্ঘ্য হবে পঞ্চাশ হাজার বৎসর। সঠিক বিষয় কেবল আল্লাহ্ই অবগত, তাফসীরকারকগণও এ বিষয়ে তেমন কোন অনুমান করতে চান নি।

সময়ের এসব পরিমাপও প্রকৃতপক্ষে আপেক্ষিক। কারণ পাপী ও অবিশ্বাসীরা কিয়ামাত এর উভয় পর্বেই কষ্টের মধ্যে থাকবে এবং ফলে তাদের কাছে পুরা সময়টুকু অতি দীর্ঘ অনুভূত হবে। অপরদিকে পুণ্যবান ব্যক্তিরা অনুভব করবেন, কিয়ামাতের পূর্বে তারা অল্পক্ষণের সুনিদ্রায় ছিলেন এবং কিয়ামাতের দিনও তাদের হিসাব সহজে ও সংক্ষেপে শেষ হয়ে যাবে বিধায় এই দিবসও তাদের কাছে অল্প সময়ই মনে হবে। ফলে কার্যত মানুষের ইহজীবনের সমাপ্তি বা মৃত্যুই তার কাছে তার কিয়ামাতের শুরু! কিয়ামাত দিবসের ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তার দীর্ঘ সময়ের তুলনায় তখন বারযাখ জীবনকে নিতান্ত অল্প সময় ও অপেক্ষাকৃত আরামের জীবন মনে হবে! আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا سكتہ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ.

৩৬:৫২। তারা (পুনরুত্থিতরা) বলবে, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে জাগালো?' (ঘোষণা হবে) এই হচ্ছে (সেই দিন) যে সম্পর্কে পরম দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণও সত্য বলেছিলেন। (৩৬:৫১ থেকে ৩৬:৬৫ দ্র:)

বিশেষ অতিরিক্ত পাঠ্য - পুনরুত্থানে কিছুটা সন্দেহপোষণকারী এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়ে আল্লাহ্ কর্তৃক এক শত বৎসর পর তাঁকে আবার জীবিত করণের ঘটনা এবং তাঁর ধারণা হওয়া যে তিনি মাত্র এক দিন বা তারও কম সময় ঘুমিয়ে ছিলেন : ২:২৫৯)

আর সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র কাছে তো সৃষ্টির যাবতীয় বস্তু ও ঘটনা সদা দৃশ্যমান (আয়াত ৫৭:২২ ইত্যাদি দ্রঃ), অর্থাৎ তাঁর কাছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলতে পৃথক কিছু নেই, - সব কালই বর্তমান; তাই সব দিন বা 'সময়' তার কাছে তাৎক্ষণিক। মানুষের কাছে যা লক্ষ লক্ষ বৎসর মনে হতে পারে, তাঁর কাছে তা মুহূর্তের বিষয়; তিনি 'হও' নির্দেশ দিলে তাঁর যা ইচ্ছা তারই সৃষ্টি হয়ে যায় বা ঘটে যায়। তথাপি সৃষ্টির রহস্যের মধ্যে তিনি কিছু কার্য-কারণ সম্পর্ক বিন্যাস

করেছেন, যার ফলে সৃষ্ট বস্তুসমূহ এবং ক্রমপরিবর্তনশীল ঘটনাবলী পরস্পর নির্ভরশীল বিবিধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে এবং এই প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে আমরা সময়ের বিস্তার অনুভব করি। যেমন এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় আকাশে মেঘ জমে, তার পর শুষ্ক মাটির উপর বৃষ্টি হয়, বীজ থেকে তখন চারা হয়, পানি, মাটি আর সূর্যের আলোর বিক্রিয়ার মাধ্যমে চারা বড় হয়, তাতে ফল বা শস্য জন্মায় এবং এ থেকে আবার বীজ হয়ে তা পুরো প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তিতে অংশ নেয়। অথচ হাজার রকমের এসব প্রক্রিয়া ও তাদের পুনরাবৃত্তির জন্য আল্লাহ্ তা'আলার শুধু একটি নির্দেশ 'হও' কাজ করে এবং তাঁর কাছে তা ঘটে 'তাৎক্ষণিক'ভাবে।

তাই কুরআনুল করীমে কিয়ামাত তথা বিচার দিবসকে যে একটি দিন, এমনকি কখনো ঘণ্টাও (সময় অর্থেই) বলা হয়েছে তা আল্লাহ্‌র 'দৃষ্টিতে' অতি অল্প সময়ই। মানুষের কাছে তা হাজার (বা পঞ্চাশ হাজার) বৎসরের মতই দীর্ঘ, তদুপরি পুরা সময়টাই এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তা ও অপেক্ষার সময়।

তখন আবার কিয়ামাত দিবসের দৈর্ঘ্যের তুলনায় পৃথিবীর জীবন মানুষের কাছে অতি অল্পসময়ের বিষয় বলেই মনে হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রশ্নের উত্তরে তারা তাই বলবে :

২৩:১১২। আল্লাহ্ তাদেরকে বলবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে কত বৎসর অবস্থান করেছিলে?'

২৩:১১৩। তারা বলবে, 'আমরা একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছিলাম। আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে (কিরামান কাতিবীন ফিরিশতা) জিজ্ঞাসা করুন।'

২৩:১১৪। তিনি বলবেন, 'তোমরা (আখিরাতের সময়ের তুলনায়) অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে।'

(অনুরূপ আয়াত - ১০:৪৫, ৪৬:৩৫, ৭৯:৪৬)

তাফসীর ইবনে কাসীরে উপরের তিনটি আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে, একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'মানুষের এই একদিন বা দিনের একাংশ সময় পৃথিবীতে থাকার কথা বলার পর আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদেরকে বলবেন, 'তবে তো তোমরা বড়ই ভাগ্যবান যে, এই অল্প সময়ের সৎকার্যের বিনিময়ে এতো বেশী প্রতিদান প্রাপ্ত হয়েছ যে, তোমরা আমার রহমত, সন্তুষ্টি ও

জান্নাত লাভ করেছ এবং এখানে চিরকাল অবস্থান করবে।' আর জাহান্নামীদেরকে বলবেন, 'তোমরা তো তোমাদের ব্যবসায়ে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ। এটুকু সময়ের মধ্যে তোমরা আমার অসন্তুষ্টি, ক্রোধ ও জাহান্নাম ক্রয় করে নিয়েছ, যেখানে তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে।'

কুরআনে কিয়ামাত দিবসের ভাববাচক নামসমূহ

আগেই বলা হয়েছে, কিয়ামাতের এই দ্বিতীয় তথা বিচার পর্বই সকল মানুষের আসল ও দৃশ্যমান কিয়ামাত বা দণ্ডায়মান (হয়ে বিচারের সম্মুখীন) হওয়ার দিন। এই দিনের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য দিনটিকে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে বহুবিধ নামে আখ্যায়িত করেছেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই দিনকে শুধু 'ইয়াউম' বা 'দিবস' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। একাধিক ক্ষেত্রে এ দিনকে 'সা'আ' - (তথা ঘণ্টা, বিচারের সময় অর্থে ব্যবহৃত), 'ইয়াউমাল কিয়ামা' - (বিচারের জন্য দণ্ডায়মান হওয়ার দিন), 'ইয়াউমিদ্দীন' - (বিচার দিবস), 'ইয়াউমুল ফাস্‌ল' - (পুণ্যবান ও পাপীদের ফয়সালা বা বাছাই এর দিন), 'ইয়াউমূল হিসাব' - (হিসাবের দিন) এবং 'হাসর' (পুনরুত্থান ও একত্রিত করণ) বলা হয়েছে।

এছাড়া এ-দিনের ভয়াবহতা সম্বন্ধে অন্ততঃ একবার করে এই দিনকে কুরআনে বলা হয়েছে :

'ইয়াউমুন কাবীর' - ১১:৩ (ভীষণ দিবস),

'ইয়াউমুম্ মুহীত - ১১:৮৪ (সর্বগ্রাসী দিবস),

'ইয়াউমুল মাজমু'আ ও ইয়াউমুম্মাশহুদ -১১:১০৩ (সকলকে একত্র করার দিন ও উপস্থিত করার দিন),

'ইয়াউমিন আযীম'-১৯:৩৭ (মহা ঘটনাবহুল দিবস),

'ইয়াউমাল হাসরাহ'-১৯:৩৯ (অফসোস ও দুঃখের দিন),

'ইয়াউমিন আকীম' - ২২:৫৫ (দুর্যোগের দিন),

'ইয়াউমা য়ুবআসূন' - ২৬:৮৭ ও ৩৭:১৪৪ (পুনরুত্থান দিবস),

'ইয়াউমা ইয়ালকাওনা - ৩৩:৪৪ (আল্লাহ্‌র সাথে) সাক্ষাতের দিন,

'ইয়াউমুল ওয়াক্তিল মা'লুম' - ৩৮:৮১ (নির্ধারিত সময়ের দিন),

'ইয়াউমাত্তালাক'-৪০:১৫ (সকলের পরস্পর সাক্ষাৎ লাভের দিন),

'ইয়াউমাল আ-যিফাহ'-৪০:১৮ (আসন্ন দিন),

'ইয়াউমাত্তানাদ'-৪০:৩২ (পরস্পর হাঁক-ডাক ও আর্তনাদের দিবস),

'ইয়াউমা ইয়াকুমুল আশহাদ'-৪০:৫১ (সাক্ষীগণের দণ্ডায়মান হওয়ার দিন),

'ইয়াউমুল ওয়া'য়ীদ' - ৫০:২০ ওয়াদা বা সতর্কীকৃত (শাস্তির) দিন,

'ইয়াউমুল খুলুদ' - ৫০:৩৪ (অনন্ত জীবনের দিন),

'ইয়াউমুল খুরুজ' - ৫০:৪২ (কবর থেকে বের হওয়ার দিন),

'ইয়াউমুল আসির - ৫৪;৮ সতর্কীকৃত (শাস্তির) দিন,

'আল্ ওয়াকিআ'হ - ৫৬:১, ৬৯:১৫ (নিশ্চিত ঘটনা),

'ইয়াউমুল মা'লুম - ৫৬:৫০ (সুবিদিত দিবস),

'ইয়াউমিল জাম'য়ি' ও 'ইয়াউমুত্তাগাবুন'-৬৪:৯ (মহাসমাবেশ ও লাভ-লোকসানের দিন),

'আল হাক্কাহ্ - ৬৯,১,২ অবশ্যম্ভাবী ঘটনা,

'ইয়াউমুন আ'সীর'-৭৪:৯ (সংকটের দিন),

'ইয়াউমান আ'বুসান ক্বামতারীরা' - ৭৬:১০ (কঠিন যাতনাময় দিন),

'ইয়াউমান সাকীলা' - ৭৬:২৭, (কঠিন দিবস),

'নাবাইল আযীম' - ৭৮:২ (মহা সংবাদ),

'ইয়াউমুলহাক্ক' - ৭৮:৩৮ (নিশ্চিত দিবস),

'তোয়াম্মাতুল কুবরা - ৭৯:৩৪ (মহাসংকটময় ঘটনা),

'ছাখ্খাহ্' -৮০:৩৩ - কর্ণ-বিদারী (ধ্বংস) ধ্বনি,

'ইয়াউমিল মাও'উদ' - ৮৫:২ (প্রতিশ্রুত দিবস),

'গাশিয়াহ্'-৮৮:১ (অভিভূত করার ঘটনা),

'ক্বারি'আহ্'-১০১:১ (মহাবিপর্যয় বা প্রলয়ের দিন) ইত্যাদি।

কিয়ামাতকে এ সকল নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে যেন মানুষ এ দিন নিয়ে ভাবে এবং এ দিনের জন্য যথার্থ প্রস্তুতি নেয়।

৩.২। কেমন ভয়ঙ্কর হবে কিয়ামাতের দিন?

কুরআনে বিচার দিবসের ঘটনাবলী ও তার ভয়ঙ্করতার বর্ণনা অত্যন্ত চিত্রধর্মী। এসব বর্ণনা পড়ে তেমন কোন ব্যাখ্যা খোঁজার প্রয়োজন পড়ে না, সমগ্র চিত্রটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে, কিছুটা হলেও পার্থিব বিচারের আদালতের মত, যেখানে অপরাধীরা বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে শুনানীর জন্য অথবা রায়ের অপেক্ষায়। কিন্তু তুলনা ঐ পর্যন্তই, কেননা আল্লাহ্‌র সামনে সেদিন মানুষ তার মৃতাবস্থা থেকে পুনরুত্থিত হয়ে শরীর, প্রাণ ও স্মৃতিশক্তি ফিরে পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে উলঙ্গ অবস্থায়, মাথা নীচু করে এবং গলায় আমলনামা ঝুলিয়ে। তারা তখন থাকবে পৃথিবীর চাইতে বহুগুন বড় এক নূতন জগতে, উপরে থাকবে অতি নিকটে এক নূতন সূর্য। (তাফসীর ইবনে কাসীর : ৮৩:৬ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত)।

আয়শা (রা) বলেন, তিনি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছেন, পুনরুত্থান দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে খালি পায়ে, উলঙ্গ অবস্থায় এবং খৎনাবিহীনভাবে। তিনি বলেন, আমি বললাম, "হে রাসূলল্লাহ্ (সা)! সে দিন কি পুরুষ ও নারীরা একত্রে থাকবে এবং তারা কি একে অপরের দিকে তাকাবে?" এর উত্তরে আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, "আয়শা, (সে দিনের) অবস্থা এমনই ভয়াবহ হবে যে, কেউ কারো প্রতি তাকানোর (কথা চিন্তা করার ও) সম্ভাবনা থাকবে না।" (মুসলিম- ৬৮৪৪)

সেদিন একমাত্র আল্লাহ্‌র অতি প্রিয় বান্দাগণ (নবী-রাসূলগণ) ব্যতীত সবাই মহা উৎকণ্ঠা ও মানসিক কষ্টের মধ্যে সময় কাটাবে কখন তার বিচারের পালা আসবে এবং রায় কী হবে। এখানে আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না, আল্লাহ্‌র অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত সুপারিশ করার কারো কোন ক্ষমতা থাকবে না। শয়তানের প্ররোচনা থেকে মানুষ পুরোপুরি মুক্ত থাকায় সেদিন তাদের অজুহাত দেখানো ছাড়া কোন মিথ্যা কথা বলার শক্তি থাকবে না এবং যদিও থাকত তাও কাজে লাগত না, কেননা আমলনামায় তার সকল কৃতকর্মের হিসাব লিখা থাকবে এবং তার পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিও কথা বলতে পারবে (আয়াত ৩৬:৬৫ দ্রঃ)।

সেদিন মানুষ চল্লিশ, একশত কিংবা তিনশত বৎসর আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকবে, কেউ কোন কথা বলবে না। সবাই মহা উৎকণ্ঠা ও মানসিক কষ্টের মধ্যে সময় কাটাবে কখন তার বিচারের পালা আসবে এবং রায় কী হবে।

সেদিন কোন অজুহাতও কাজে লাগবে না এবং কোন উৎকোচ নেয়া-দেয়ার কেউ থাকবে না, যা দ্বারা মানুষ পৃথিবীতে বিচারকদেরকে প্রভাবিত করতে পারত। সেদিন এমন কোন উকিলও থাকবে না যে মিথ্যা যুক্তি দিয়ে উকালতি করবে এবং দোষীকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করতে পারবে। সেদিন সকলেই থাকবে একই নৌকার যাত্রী - নিজে ছাড়া কারো জন্য কিছু করার চিন্তা কেউ করতে পারবে না, - মহাবিচারক আল্লাহ্ তা'আলার বিচার হবে নিরঙ্কুশ, নিখুঁত ও সম্পূর্ণ ন্যায়ভিত্তিক। সেদিন পাপীরা বুঝবে, আল্লাহ্‌র ওয়াদাই সত্য, তারাই মিথ্যাচারিতা করে নিজেরা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

১৪:৪৮। একদিন এই পৃথিবী নূতন আরেক পৃথিবীতে পরিবর্তিত হবে, আর আকাশমণ্ডলীকেও (করা হবে পরিবর্তিত); এবং (সৃষ্ট জীবকে) উপস্থিত করা হবে আল্লাহ্‌র সম্মুখে, যিনি এক ও পরম পরাক্রমশালী।

নূতন সৃষ্ট পৃথিবী সম্পর্কে হাদীসে আছে, সাহ্ল ইব্‌নু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, 'এমন সাদা পরিষ্কার যমীনের উপর হাশর করা হবে যেমন ময়দার সাদা রুটি যার উপর কোন দাগ বা চিহ্ন থাকবে না। (সহীহ্ বুখারী ৮.৫২৮ ও মুসলিম)।

আলী (রা) বলেন, সেদিন যমীন হবে রৌপ্যের এবং আসমান হবে স্বর্ণের (রং এর)। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, যমীনের উত্তাপে সেদিন মানুষ নিজের ঘামেই ডুবতে থাকবে।

মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রা) বলেন, তিনি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছেন, "... মানুষ তার কর্মফল অনুযায়ী নিজের ঘামে নিমজ্জিত হতে থাকবে; কেউ হাঁটু পর্যন্ত, কেউ কোমর পর্যন্ত, কেউ নাক পর্যন্ত...।" মুসলিম- ৬৮৫২ (আংশিক)।

সাত ভাগ্যবান ব্যক্তি :

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "যে দিন আল্লাহ্‌র (রহমতের) ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন (তথা কিয়ামাতের দিন প্রখর সূর্যের তাপের অসহনীয় কষ্ট থেকে) সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা

তাঁর নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক, ২. সেই যুবক যার জীবন গড়ে উঠেছে তার রবের ইবাদাতের মধ্যে, ৩. সেই ব্যক্তি যার হৃদয় মসজিদের সাথে লেগে রয়েছে, ৪. সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহ্‌র জন্য পরস্পরকে ভালবাসে, একত্র হয় আল্লাহ্‌র জন্য এবং পৃথকও হয় আল্লাহ্‌র জন্য, ৫. সেই ব্যক্তি যাকে কোন উচ্চ বংশীয় রূপসী নারী (যৌন কর্মে) আহ্বান জানায়, কিন্তু সে এ বলে তা প্রত্যাখ্যান করে যে, 'আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি', ৬. সে ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানে না, এবং ৭. সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহ্‌র যিকির করে ও তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়। বুখারী-১.৬২৯ ও ২.৫০৪ এবং মুসলিম-৫.২২৪৮।

বিচার দিবসের শুরু : মহাতঙ্কে যেদিন মানুষ তার প্রিয়জনদের দিকেও তাকাবে না

৮০:৩৩। অবশেষে যখন কর্ণ-বিদারী আওয়াজ (শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুৎকার) আসবে,-

৮০:৩৪। সেদিন মানুষ তার (আপন) ভাই এর নিকট থেকে পলায়ন করবে,

৮০:৩৫। এবং তার মাতা ও তার পিতা থেকে,

৮০:৩৬। এবং তার স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি থেকেও (পালাবে);

৮০:৩৭। সেদিন প্রত্যেকের নিজের অবস্থা এমনই গুরুতর হবে যে, অন্য কারো প্রতি কেউ মনোযোগ দিতে পারবে না।

৮০:৩৮। কিছু লোকের (প্রকৃত ঈমানদার ও একত্ববাদীদের) চেহারা সেদিন হবে উজ্জ্বল,

৮০:৩৯। (জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্তিতে) সহাস্য ও প্রফুল্ল;

৮০:৪০। আর বাকী (পাপী) লোকদের মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলিধূসর (মলিন),

৮০:৪১। সেগুলি কালিমায় আচ্ছন্ন থাকবে,

৮০:৪২। এরাই হচ্ছে কাফির ও পাপিষ্ঠ।

৪৩:৬৭। সেদিন (দুনিয়ার) বন্ধুরা একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে, কেবল আল্লাহ্-ভীরুগণ ব্যতীত।

হাদীসে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, সেদিন স্বামী নিজের স্ত্রীর কাছে মাত্র

একটি পুণ্য চাইবে, কিন্তু স্ত্রী বলবে আমি তাও দিতে অক্ষম, কেননা আমি আমার বিপদ নিয়েই শংকিত। পিতা-পুত্রের মধ্যেও একই বাক্যালাপ আদান প্রদান হবে।

আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না

বিচার দিবসে আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না, অন্যের জন্য কিছু করার কারো কোন ক্ষমতা থাকবে না, আর পাপীদেরকে তৃষ্ণার্ত পশুর মত তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে! আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন :

৮২:১৮। আবার (তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে), বিচার দিবস কি, সে সম্বন্ধে তুমি কী জান?

৮২:১৯। এ হবে সেদিন, যখন একের অপরের জন্য কোন কিছু করার সামর্থ্য থাকবে না, (কেননা), সেদিন সকল কর্তৃত্ব থাকবে কেবল আল্লাহ্‌রই হাতে।

১৮:৪৯। আর (প্রত্যেকের সামনে তার) আমলনামা উপস্থিত করা হবে এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি পাপীদেরকে দেখবে আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে, 'হায় দুর্ভাগ্য আমাদের! এ কেমন গ্রন্থ! এ তো ছোট বড় (কোন কাজের) কিছুই বাদ দেয় না; বরং তা সমস্ত হিসাব রেখেছে!' তারা তাদের সকল কৃতকর্ম (এর তালিকা) সামনেই উপস্থিত পাবে; আর তোমার প্রতিপালক (সেদিন) কারো প্রতি অবিচার করবেন না।

১৯:৮৫। সেদিন *আমরা* মুত্তাকী (আল্লাহ্ ভীরু ও পুণ্যবান)-গণকে সম্মানিত মেহমানরূপে দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছে সমবেত করব,

১৯:৮৬। আর পাপীদেরকে জাহান্নামের দিকে তৃষ্ণার্ত (পশুপালের ন্যায়) তাড়িয়ে নিয়ে যাব।

১৯:৮৭। কারো সুপারিশ করার কোন ক্ষমতা থাকবে না কেবল সে ব্যতীত, যে (রাসূল সা) দয়াময় আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে। (অনুরূপ - ১১:১০৫, ২০:১০৯)।

২০:১০৮। সেদিন তারা সোজা আহ্বানকারীর (ফিরিশতার) অনুসরণ করবে, (তাদের পক্ষে দেখানো সম্ভব এমন) কোন বাঁকা পথ তার জন্য থাকবে না। দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলার (সর্বময় ক্ষমতার) সামনে সকল শব্দ ক্ষীণ হয়ে যাবে, (চলমান মানুষের) মৃদু পদধ্বনি ছাড়া তুমি কিছুই

৩২:১২। যদি তুমি (সে দৃশ্য) দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! (আজ সবকিছু) আমরা দেখলাম ও শুনলাম, অতএব এখন তুমি আমাদেরকে আবার (পৃথিবীতে) পাঠিয়ে দাও, আমরা সৎকর্ম করবো, (কেননা এখন) আমরা অবশ্যই পুরোপুরি বিশ্বাসী'! (অনুরূপ - ৪০:১১)।

৭৮:৩৮। সেদিন রূহ (জিব্রীল আ অথবা সকল মানুষের রূহ) ও ফিরিশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় (আল্লাহ্ তা'আলা) যাকে অনুমতি দেবেন সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলবে না এবং সে কেবল যথার্থ কথা বলবে।

৭৮:৩৯। সেই দিন (সংঘটিত হওয়া) সত্য ও সুনিশ্চিত; অতএব যে চায় সে যেন তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হয়।

৭৮:৪০। আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম, সেদিন মানুষ তার দু হাতের পাঠানো (কৃতকর্ম) প্রত্যক্ষ করবে এবং কাফিররা বলবে, 'হায়! (মানুষ না হয়ে) আমি যদি মাটি হতাম (তাহলে তো বিচারের সম্মুখীন হতে হতো না)'!

(অতিরিক্ত পাঠ্য - ৭৯:৬-৭৯:১৪)

নবী মুহাম্মদ (সা)-এর শাফা'আত :

শাফা'আতের শাব্দিক অর্থ সুপারিশ করা, ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে, কারো পাপের শাস্তি না দেয়ার জন্য প্রার্থনা করা। শাফা'আত সম্পর্কে বিবিধ হাদীসে যে সব বর্ণনা এসেছে তার সারমর্ম নীচে উদ্ধৃত করা হলো :

'কিয়ামাত দিবসের দৈর্ঘ্য ও সময়ের আপেক্ষিকতা সম্পর্কিত ধারণা' অনুচ্ছেদে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, শেষ বিচারের দিন মানুষ চল্লিশ, একশত কিংবা তিনশত বৎসর আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকবে, কেউ কোন কথা বলবে না। সেদিন সবাই মহা উৎকণ্ঠা ও মানসিক কষ্টের মধ্যে সময় কাটাবে কখন তার বিচারের পালা আসবে এবং রায় কী হবে।

এই মহা উৎকণ্ঠা ও শারীরিক এবং মানসিক কষ্ট ও অনিশ্চয়তা থেকে রেহাই পেতে মানুষ অবশেষে নবীদের কাছে শাফা'আতের জন্য যাবে। আদম (আ) থেকে শুরু করে মানুষ বড় বড় সকল নবী-রাসূলগণের কাছে ধর্ণা দেবে যেন

তাঁরা আল্লাহ্‌র কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করত তাদের বিচার শেষ করান এবং তাদেরকে এই মহা বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) ছাড়া আর বাকী সকলেই তাঁদের নিজেদের পার্থিব জীবনের কিছু ভুলত্রুটির কথা স্মরণ করত আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করার ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করবেন। সবার মুখে সেদিন একই কথা - 'ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী' - আমার কী হবে, আমার কী হবে! একমাত্র শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) সাধারণভাবে সকলের জন্য এবং বিশেষভাবে তাঁর উম্মতের ক্ষমার জন্য শাফা'আত করার অনুমতি পাবেন। তিনিও (সা) অনুমতি পাবার পূর্বে আরশের নীচে আল্লাহ্‌র সামনে সিজদায় পড়ে যাবেন। খুব বেশী করে তিনি আল্লাহ্‌র গুণকীর্তন ও প্রশংসা করবেন। দীর্ঘক্ষণ তিনি সিজদায় পড়ে থাকবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, 'হে মুহাম্মদ (সা)! মাথা উঠাও, কথা বল, তোমার কথা শোনা হবে। শাফা'আত কর, তোমার শাফা'আত কবুল করা হবে।' রাসূল (সা) তখন সমগ্র মানব জাতির জন্য বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে আল্লাহ্‌র কাছে আবেদন জানাবেন।

মুহাম্মদ (সা) এর এই প্রথম শাফা'আতকে শাফা'আত-আল-কুবরা বা শাফা'আত-আল-উযমা বলা হয়। এই শাফা'আত এর পরই শুরু হবে বিচার পর্ব।

বিচারের পর রাসূল (সা) তাঁর উম্মাহ্‌র জন্য বিশেষভাবে শাফা'আত করবেন। তিনি পর পর চার দফায় সুপারিশ করে তাঁর নির্ধারিত সংখ্যার উম্মাহ্‌কে জান্নাতে নিয়ে যাবেন, যাদের মধ্যে এমন লোক থাকবে যারা এই সুপারিশ ছাড়া জান্নাতে যেতে পারত না। (বুখারী - ৬.২৩৬, ৮.৫৭০, ৯.৫০৭, ৯.৫৩২খ, মুসলিম - ৩৭৩, ৩৭৭, ৩৭৮ ইত্যাদি সুদীর্ঘ হাদীসের সারসংক্ষেপ)।

তবে কোন বান্দাই কেবল তার নিজের আমলের দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, সকলকেই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করতে হবে, কেননা বান্দার কোন আমলই জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য যথেষ্ট নয়।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "এমন কেউই নেই, যার (কেবল) নিজস্ব আমল তাকে জান্নাতে প্রবেশের অধিকার দেবে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আল্লাহর রাসূল! এমন কি আপনিও নন?' তদুত্তরে তিনি (সা) বললেন, 'আমিও নই, তবে আমার প্রতিপালক স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে ঘিরে রেখেছেন।" (মুসলিম-৬৭৬১ আংশিক)

অন্যান্যদের শাফা'আত

পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'আলা আপন অনুগ্রহে কিছু ঈমানদার ও কিছু বিশেষজনকে শাফা'আত করার অনুমতি দিবেন এবং কিছু সৎ আমল (যথা সিয়াম ইত্যাদি) বা সৎ আমলের উপাদানও (যেমন তিলাওয়াতকারীর জন্য কুরআন) মানুষের জন্য শাফা'আত করবে। শির্কমুক্ত ঈমান ছাড়া কেউই সুপারিশ করার বা সুপারিশ পাবার যোগ্যতা রাখে না। কাফির, মুনাফিক ও মুশরিকদের জন্য কোন শাফা'আত নেই, তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত। আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারবে না (আয়াত ২:২৫৫, ১০:৩, ১৯:৮৭, ২০:১০৯ ইত্যাদি দ্রঃ), এবং যাদের জন্য শাফা'আত করা যাবে তাদের জন্যও কেবল আল্লাহ্র অনুমতি সাপেক্ষে শাফা'আত করা যাবে (আয়াত ২১:২৮, ৫৩:২৬ ইত্যাদি দ্রঃ)। আর আল্লাহ কেবল তাদের জন্যই শাফা'আত এর অনুমতি দেবেন যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট (২১:২৮)। সর্বাবস্থায় শাফা'আত গ্রহণ করা বা না করা মহান আল্লাহ্র ইচ্ছা, শাফা'আত এর মালিকানা, অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্র। এ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে আরো অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে (২:৪৮, ২:১২৩, ২:২৫৪, ৬:৫১, ৬:৭০, ১০:১৮ ইত্যাদি)। শাফা'আত সম্পর্কে এ ধরনের তথ্যাদি নিয়ে বহু বিশুদ্ধ হাদীসও রয়েছে।

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ জনসাধারণ, বিশেষত পীর-ভক্তদের মধ্যে অনেকের ধারণা আছে যে তাদের পীর-মুর্শিদগণ তাদের জন্য পরকালে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন এবং এর ফলে তারা (প্রয়োজনীয় সৎ আমল থাক বা না থাক) নাজাত পেয়ে যাবে। এ সকল নির্বোধরা এটা ভেবেও দেখে না যে, যে পীর তাদের জন্য সুপারিশ করতে পারবেন বলে তারা বিশ্বাস করে, কিংবা যিনি সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখেন বলে দাবী করেন তিনি তার নিজের সুপারিশ যে লাগবে না, বা লাগলে তার সুপারিশ কে করবে সে নিশ্চয়তা বা জ্ঞান তাকে কে দিয়েছে? কেননা সুপারিশ কে করতে পারবে অর্থাৎ রাসূল (সা) ছাড়া আর কাকে আল্লাহ্ সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন, তা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। যারা পরকালে অন্যের জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখে বলে দাবী করে কিংবা এরকম গায়বী জ্ঞান জানে বলে দাবী করে তারা ভণ্ড এবং স্পষ্ট শিরক-এ লিপ্ত।

হাউয-এ-কাউসার

আল্লাহ্ তা'আলা নবী মুহাম্মদ (সা)কে কিয়ামাত দিবসে হাউয-এ-কাউসার বা সুপেয় পানীয়ের বিশাল এক জলাধার দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (সূরা

কাউসার)। বহু বিশুদ্ধ হাদীসেও এর উল্লেখ আছে। এই হাউয-এ-কাউসারের তীরে থাকবে অসংখ্য পান পাত্র এবং এখান থেকে নবীর উম্মাতগণ পানি পান করত তৃষ্ণা মিটাবেন, কিন্তু বিদ'আতীদেরকে সেখানে ভিড়তে দেয়া হবে না।

হাদীসে আছে, আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমার উম্মাত হাউযের পাড়ে আমার কাছে আসবে আর আমি তখন (অন্যান্য উম্মাতের) লোকজনকে সে হাউয থেকে ফিরিয়ে দিতে থাকব যেমনিভাবে লোকে অন্যের উটকে নিজের উট থেকে ফিরিয়ে রাখে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি কি আমাদেরে চিনতে পারবেন? তিনি বললেন, হাঁ, তোমাদের এমন এক চিহ্ন থাকবে যা তোমাদের ছাড়া অন্য কারো থাকবে না। (আর তা হলো) তোমরা আমার কাছে আসবে মুখমণ্ডল ও হাত-পা উজ্জ্বল অবস্থায়। এটা হবে ওযুর কারণে। আর তোমাদের মধ্য থেকেই একটি দলকে আমার কাছে আসতে বাধা দেয়া হবে, তাই তারা আমার কাছে আসতে পারবে না। তখন আমি বলব, প্রভু! এরা তো আমার লোকজন! তখন একজন ফিরিশতা আমাকে বলবে, 'আপনি কি জানেন, এরা আপনার পরে কী অঘটন (অবাধ্যতা ও বিদ্‌আত সৃষ্টি) ঘটিয়েছিল? - মুসলিম-৪৭৩, ৪৭৪ (ভিন্ন সনদে), বুখারী-১৩৮ (এবং মুসলিম-৪৭০, ৪৭১ ও ৪৭২ অনুরূপ, তবে সংক্ষিপ্ত)।

৩.৩। বিচার প্রক্রিয়ার শুরু : সাক্ষ্য পর্ব

সাক্ষীদের আহ্বান

কিয়ামাত দিবসে বিচারের সম্মুখীন হয়ে মানুষ যাতে কোন অজুহাত দেখাতে না পারে, কিংবা তার প্রতি কোন রকম অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা আছে মনে করতে না পারে, সেজন্য তার সামনে সম্ভাব্য সকল প্রকার সাক্ষী হাজির করা হবে এবং মানুষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল সুযোগই দেয়া হবে। অবিশ্বাসী ও পাপীদের বিরুদ্ধে সেদিন তাদের নবীগণ, ফিরিশতাগণ এবং যে সকল মূর্তিদের তারা পূজা করত তারা সবাই সাক্ষ্য দেবে। এমনকি পাপীরা নিজেরাও নিজেদের এবং একে অন্যের বিরুদ্ধে কথা বলবে, তাদের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গও তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে! কেননা সেদিন পাপীদের (তথা কোন মানুষের) মিথ্যা কথা বলার ক্ষমতা থাকবে না। আর এটা মনে রাখতে হবে যে, মানুষের পক্ষে বা বিপক্ষে সবচেয়ে বড় সাক্ষী হবে তার আমলনামা বা সারাজীবনের কৃতকর্মের হিসাব, যা তার গলায় ঝুলে থাকবে।

সর্বপ্রথম যে বিষয়সমূহের হিসাব নেয়া হবে তা হচ্ছে সালাত ও পাঁচটি বিষয়

কিয়ামাতের দিন মানুষকে তার ছোট বড় প্রতিটি কথা ও কর্মের জওয়াবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে। তবে সর্বপ্রথম যে কাজের হিসাব তাকে দিতে হবে তা হচ্ছে নামায। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

"পুনরুত্থানের দিন মানুষের আমলের সর্বপ্রথম যে বিষয়ের হিসাব নেয়া হবে তা হচ্ছে সালাত। আমাদের প্রতিপালক তাঁর ফিরিশতাদেরকে বলবেন, যদিও তিনিই সর্বাধিক জ্ঞাত, 'আমার বান্দার সালাত (পরীক্ষা করে) দেখ, এটা কি পূর্ণ না এতে ঘাটতি আছে?' যদি তা সর্বোতভাবে পূর্ণ হয় তা হলে তা সম্পূর্ণ হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হবে। কিন্তু যদি ঘাটতি থাকে তবে তিনি বলবেন, 'খোঁজে দেখ আমার বান্দা কোন নফল সালাত আদায় করেছে কি না।' যদি সে নফল সালাত আদায় করে থাকে তবে তিনি বলবেন, 'আমার বান্দার ফরয সালাত (এর ঘাটতি) তার নফল সালাত দ্বারা পূর্ণ করে দাও।' তৎপর তার বাকী আমলগুলিও একইভাবে পরীক্ষা করা হবে।" সহীহ্ আবু দাউদ-৭৭০, আলবানী কর্তৃক সহীহ্ হিসেবে শ্রেণীভুক্ত।

এ ছাড়া সামগ্রিকভাবে পাঁচ ধরনের কাজের ব্যাপারেও প্রত্যেক মানুষ অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। সুনানে তিরমিযীতে উদ্ধৃত আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসূদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

"পুনরুত্থান দিবসে আদম সন্তানকে তাঁর রবের সামনে থেকে ছেড়ে দেয়া হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় : ১. তার জীবন এবং কিভাবে তা সে যাপন করেছে, ২. তার যৌবন এবং কিভাবে তা সে কাজে লাগিয়েছে, ৩. তার সম্পদ এবং কিভাবে তা সে অর্জন করেছে ও ৪. কিভাবে তা ব্যয় করেছে, এবং ৫. যে জ্ঞান সে লাভ করেছে তা সে কিভাবে ব্যবহার করেছে।" সহীহ্ আল জামী-৬/১৪৮ নং৭১৭৭।

পাপীদের দোষ স্বীকার

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

৬:১২৮। যে দিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে একত্রিত করবেন, (এবং বলবেন), হে জ্বিন সম্প্রদায় (এর শয়তানরা)! 'তোমরা তো অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছো'; এবং মানব সমাজের মধ্যে তাদের (শয়তানদের) বন্ধুগণ

(বিপথগামীরা) বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা (পার্থিব জীবনে) একে অপরের দ্বারা লাভবান হয়েছি, (কিন্তু হায়!), তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারিত করেছিলে তাতে (এখন) আমরা উপনীত হয়েছি'। আল্লাহ্ বলবেন, জাহান্নামের আগুনই (হবে) তোমাদের বাসস্থান, সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে, যদি না আল্লাহ্ (কাউকে রক্ষা করতে) ইচ্ছা করেন। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রজ্ঞাময় এবং সম্যক অবহিত।

৬:১২৯। আমি এভাবেই অন্যায়কারীদের কৃতকর্মের জন্য তাদের এক দলকে অন্য দলের (পাপকার্যের সহযোগী) বন্ধু করে দিই।

৬:১৩০। (আর তাদেরকে বলব), 'হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য থেকে কি রাসূলগণ তোমাদের নিকট আসেনি যারা তোমাদের নিকট আমার নিদর্শন বিবৃত করত এবং তোমাদেরকে এই দিনের সম্মুখীন হওয়া সম্পর্কে সতর্ক করত?' তারা বলবে '(হাঁ, তবে আজ) আমরা আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি।' বস্তুত পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছিল, আর তারা নিজেদের বিরুদ্ধে এ সাক্ষ্যও দেবে যে তারা (আসলেই) কাফির ছিল।

সেদিন প্রত্যেক জাতির নবীগণ এবং ফিরিশতারাও কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন

১৬:৮৪। যে দিন *আমরা* প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে এক এক জন করে সাক্ষী (তাদের নবী) উত্থিত করব, সে দিন (সাক্ষ্য ও রায় শেষে) অবিশ্বাসীদেরকে (কৈফিয়ত দেবার) অনুমতি দেয়া হবে না, কিংবা তাদেরকে (অনুশোচনা বা ক্ষমা চাওয়ার জন্য) কোনরূপ ছাড় দেয়া হবে না।

১৬:৮৫। যখন পাপীরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তাদের শাস্তিও লঘু করা হবে না আর তাদেরকে কোন অবকাশও দেয়া হবে না।

৩৪:৪০। এবং (স্মরণ করো সে দিনের) যে দিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে একত্র করবেন এবং ফিরিশতাগণকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'এরা কি তোমাদেরই ইবাদাত করত?'

৩৪:৪১। ফিরিশতারা বলবে, (হে আল্লাহ্!) 'তুমি পবিত্র, মহান! তুমিই আমাদের অভিভাবক, তারা নয়; বরং তারা তো জ্বিন (শয়তান)-দের উপাসনা করত এবং তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের (শয়তানদের) প্রতি বিশ্বাসী।'

মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে :

কিয়ামাতের দিন পাপীরা প্রথমে নিজের পাপের কথা অস্বীকার করবে, তারপর তাদের বিরুদ্ধে ফিরিশতা ও অন্যান্য সাক্ষীদের দেয়া সাক্ষ্যও তারা অস্বীকার করবে। তখন তাদের মুখে ছিপি লাগিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করতে থাকবে।

৩৬:৬৫। এই দিন আমি তাদের মুখে ছিপি এঁটে দেব, তাদের হস্তদ্বয় আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের সকল কৃতকর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে।

৪১:১৯। যে দিন আল্লাহ্‌র শত্রুদেরকে জাহান্নামের দিকে জড়ো করা হবে, সে দিন তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করে (হাঁকিয়ে) নেয়া হবে;

৪১:২০। অবশেষে যখন তারা জাহান্নামের কাছে পৌছাবে, তখন তাদের কান, চোখ ও শরীরের চামড়া তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে।

৪১:২১। তখন তারা তাদের চামড়াকে বলবে, 'তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন?' তারা উত্তর দিবে, 'আল্লাহ্ তা'আলা যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনিই (আজ) আমাদেরকে বাকশক্তি দিয়েছেন : তিনিই তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।'

৪১:২২। তোমরা কোনকিছুই গোপন করতে চাইতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চোখ ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না, - উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানতেন না।'

৪১:২৩। 'তোমাদের প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে, ফলে (এখন) তোমরা চরম ক্ষতিগ্রস্তদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছ।

আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, বিচারের দিন (পাপী) বান্দা বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি কি আমাকে অবিচার থেকে রক্ষার নিশ্চয়তা দেন নি? আল্লাহ্ বলবেন, হ্যাঁ। বান্দা তখন বলবে, আমি নিজেকে ছাড়া অন্য কোন সাক্ষী কর্তৃক আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করি না। তিনি বলবেন, ঠিক আছে, তোমার বিপক্ষে তোমার নিজের এবং তোমার আমল লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে নিযুক্ত ফিরিশতার সাক্ষ্যই তোমার

জন্য যথেষ্ট হবে। অতপর তার মুখে ছিপি এঁটে দেয়া হবে এবং তার হাত ও পা-সমূহকে কথা বলতে বলা হবে এবং তারা তার সকল কর্ম বলে দেবে। তারপর তার মুখকে কথা বলতে দেয়া হবে এবং মুখ (হাত ও পা কে) বলবে, চলে যাও তোমরা, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ! তোমাদের নিরাপত্তার জন্যই তো আমি এই প্রচেষ্টা করেছিলাম! (মুসলিম - ৭০৭৯ সংক্ষেপিত)।

৩.৪। বিচারের যুক্তিতর্কের পর্ব ও চূড়ান্ত রায়

বিচার দিবসে যেহেতু কেউই কারো সাহায্য করতে আসবে না এবং অবিশ্বাসীদের জন্য সুপারিশ করারও কেউ থাকবে না, সেহেতু শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য অথবা শাস্তি কিছুটা হলেও কমানোর চেষ্টা করার প্রয়াসে কাফিররা এবং বিশেষতঃ মুশরিকরা বিভিন্ন রকম যুক্তিতর্ক উত্থাপন করবে আর পরস্পরকে দোষারোপ করবে। তারা তখন কেউ দোষারোপ করবে শয়তানকে, কেউ সবল ও অহংকারী সমাজপতিকে, মুশরিকরা দোষারোপ করবে তাদের মূর্তিসমূহকে এবং সাধারণভাবে সকল পাপীই তাদের সে-সকল নেতাদের উপর দোষ চাপাবে যাদেরকে তারা অনুসরণ করত। তারা সবাই যুক্তি দেখাবে, যারা তাদেরকে বিপথগামী করেছিল, তারাই প্রকৃত দোষী এবং সকল শাস্তি তাদের প্রাপ্য, কিংবা তাদেরকে দ্বিগুন শাস্তি দিতে হবে, অথবা কমপক্ষে তারা তাদের অনুসারীদের শাস্তির অংশীদার হোক! নেতারা পাল্টা যুক্তি দেখাবে, তোমাদেরকে সৎপথ তো দেখানো হয়েছিল, তা কেন অনুসরণ করনি? কিন্তু মহান বিচারক আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে এসব যুক্তি চলবে না, কেননা তিনি স্মরণ করিয়ে দেবেন, প্রত্যেককে তো এ কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, নিজ কৃতকর্মের জন্য প্রত্যেকে নিজেই দায়ী থাকবে (আয়াত ৬:১৬৪, ১৭:১৫, ৩৫:১৮, ৩৯:৭ ও ৫৩:৩৮ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।

পাপীদের যুক্তিতর্ক, পরস্পরকে দোষারোপ ও আত্মরক্ষার চেষ্টা

আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টায় পাপীদের মধ্যকার পদানত ও দুর্বল অনুসারী এবং তাদের অহংকারী নেতাদের মধ্যকার পারস্পরিক দোষারোপ ও যুক্তিতর্ক :

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন,

১৪:২১। (মহাবিচারের দিন) তাদের সকলকে আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। যারা ছিল অহংকারী (নেতা) তাদেরকে দুর্বলেরা বলবে, 'আমরা তো

কেবল তোমাদের অনুসারী ছিলাম; এখন কি তোমরা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে?' তারা উত্তর দেবে, 'আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করলে আমরাও তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতাম। এখন আমরা ধৈর্যচ্যুত হই অথবা ধৈর্যশীল হই তাতে কোন তফাৎ নেই, (কেননা) আমাদের কোন নিষ্কৃতি নেই।

৩৩:৬৭। তারা আরো বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড়লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ছিল;

৩৩:৬৮। 'হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে দ্বিগুন শাস্তি দাও এবং মহাঅভিসম্পাতে তাদেরকে করো অভিশপ্ত।'

৩৪:৩১। কাফিরগণ বলে, 'আমরা এই কুরআনে কখনো বিশ্বাস করবো না, এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও না।' হায়! যদি তুমি (সে দৃশ্য) দেখতে, যখন যালিমদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকবে : যারা ছিল দুর্বল (ও অবহেলিত) তারা ক্ষমতাদর্পীদের বলবে, 'তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম।

৩৪:৩২। (জবাবে) ক্ষমতাদর্পীরা (দাবিয়ে রাখা) দুর্বলদেরকে বলবে, 'তোমাদের কাছে সৎপথের দিশা আসার পর আমরা কি তা থেকে তোমাদেরকে নিবৃত করেছিলাম? বস্তুত তোমরাইতো ছিলে অপরাধী (অবিশ্বাসী, পাপী)।'

৩৪:৩৩। (দাবিয়ে রাখা) দুর্বলরা (এবার) অহংকারী ক্ষমতাবানদের বলবে, 'প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল তোমাদেরই দিবারাত্রের চক্রান্ত, যখন তোমরা আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহ্‌কে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক দাঁড় করাই।' (এই বাদ-প্রতিবাদরত অবস্থায়) যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা উভয় পক্ষ (পৃথিবীতে আল্লাহকে অমান্য করার জন্য) নিজেদের অনুতাপ গোপন করবে; : (সে দিন) অবিশ্বাসীদের গলায় *আমরা* শিকল পরিয়ে দেব, - আর তা হবে তাদের কৃতকর্মেরই (যথার্থ) প্রতিফল।

৩৭:২৭। আর তারা একে অপরের সামনা সামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, -

৩৭:২৮। তারা (পদানতরা) বলবে, 'তোমরাই তো তোমাদের ডান হস্ত (ক্ষমতার দণ্ড ও আল্লাহ্‌র অবাধ্য হওয়ার আদেশ) নিয়ে আমাদের কাছে আসতে।'

৩৭:২৯। তারা (ক্ষমতাবান নেতারা) বলবে, 'তোমরাই (নিজেরা) তো বিশ্বাসী ছিলে না।'

৩৭:৩০। 'এবং তোমাদের উপর তো (জোর করে পাপ করানোর মত) আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না; প্রকৃত পক্ষে তোমরাই ছিলে মারাত্মক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।'

৩৭:৩১। অতএব আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে (যে), আমাদের (উভয় পক্ষ)-কে অবশ্যই (নিজেদের পাপের শাস্তি) আস্বাদন করতে হবে।

৩৭:৩২। আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, কেননা আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত।'

৪১:২৯। আর কাফিররা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! যে সকল জ্বিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল তাদেরকে দেখিয়ে দাও, আমরা তাদেরকে পদদলিত করব যাতে তারা (সকলের সামনে চরম) লাঞ্ছিত হয়।

পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা তাদের পূর্ববর্তীদেরকে দোষারোপ করবে

৭:৩৮। আল্লাহ্ (পাপীদেরকে) বলবেন, 'তোমাদের পূর্বে যে সকল জ্বিন ও মানবের দল গত হয়েছে তাদের সাথে তোমরা জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করো'। যখনই কোন দল তাতে প্রবেশ করবে, তখনই তারা (পূর্ববর্তী) অপর দলকে অভিসম্পাত করবে; এভাবে যখন সকলে তাতে একত্র হবে তখন তাদের শেষের দল তাদের পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই (পৃথিবীতে) আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল; অতএব তাদেরকে দ্বিগুন পরিমাণ (জাহান্নামের) আগুনের শাস্তি দাও!' আল্লাহ্ বলবেন, '(তোমাদের) প্রত্যেকের জন্য শাস্তি দ্বিগুন করে দেয়া হলো; কিন্তু (হে মানুষ), তোমরা তা জান না।'

৭:৩৯। (এবার) তাদের পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদেরকে বলবে, '(দেখলে তো), আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব (বা সুবিধা) নেই, সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করো!'

মুশরিকরা তাদের উপাস্য দেবতাদের প্রতি দোষারোপ করবে

২৮:৬২। সে দিন আল্লাহ্ তাদেরকে আহ্বান করে বলবেন, কোথায় আমার সেই সব (তথাকথিত) শরীক যাদেরকে তোমরা আমার অংশীদার গণ্য করতে?

১৬:৮৬। মুশরিকরা যাদেরকে আল্লাহ্‌র শরীক বানিয়েছিল তাদেরকে যখন দেখবে তখন বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই তারা, যাদেরকে আমরা তোমার শরীক করে তোমার পরিবর্তে ডাকতাম'; কিন্তু তারা (শরীক বা উপাস্য বস্তুরা) উল্টো তাদের প্রতি প্রত্যুত্তর দেবে, 'প্রকৃতপক্ষে তোমরাই মিথ্যাবাদী!'

(কারণ জড়বস্তুর তৈরী মূর্তিরা তো তাদেরকে পূজা করতে মুশরিকদেরকে আদেশ দেয়ার কোন ক্ষমতাও রাখতো না, এমনকি তারা আদৌ জানতও না যে কিছু মানুষ তাদের ইবাদাত করত!)

২৮:৬৩। যাদের উপর শাস্তি অবধারিত হয়ে যাবে তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই হচ্ছে সে-সব লোক যাদেরকে আমরা বিপথগামী করেছিলাম; এদেরকে আমরা (সেভাবে) বিপথগামী করেছিলাম যেমন আমরা নিজেরা বিপথগামী ছিলাম; (আজ) আমরা তোমার সমীপে (তাদের থেকে) দায় মুক্ত হয়ে যাচ্ছি, (কেননা) আসলে এরা আমাদের ইবাদাত করত না (তাদের প্রবৃত্তির গোলামী করত)।

২৮:৬৪। তাদেরকে (মুশরিকদেরকে) বলা হবে, 'তোমাদের শরীক (দেবতা)-দেরকে ডাকো। তখন তারা তাদের ডাকবে, কিন্তু ওরা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না। এর পর তারা (আসন্ন) শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। হায়! যদি তারা (পৃথিবীতে) সৎপথ অনুসরণ করত।

অবশেষে সকল পাপের যে মূল উৎস, সেই শয়তান প্রথমবারের মত মানব জাতিকে বিশেষত পাপীদেরকে সত্য কথা বলবে এবং তার আসল পরিচয় জানিয়ে দেবে।

১৪:২২। যখন বিচার কার্য সম্পাদন (ও রায়) হয়ে যাবে তখন শয়তান (মানুষকে) বলবে, 'আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদেরকে (যে) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন (তা' ছিল) সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে (অনেক) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি। আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিল না, আমি কেবল তোমাদেরকে (আমার পথে) ডেকে ছিলাম, আর তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং আমাকে তোমরা দোষারোপ করো না, বরং তোমরা নিজেদেরই প্রতি দোষারোপ করো। (আজ) না আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম, আর না তোমরা আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম। তোমরা যে পূর্বে আমাকে

(আল্লাহ্‌র) শরীক বানিয়েছিলে আমি তা অস্বীকার করছি। সকল অন্যায়কারীদের জন্য অবশ্যই রয়েছে কঠিন শাস্তি।

পুণ্যবানদের জন্য সেদিন রয়েছে কেবল সুসংবাদ, তাদের বিচার হবে সংক্ষিপ্ত

আল্লাহ্‌র খাঁটি ঈমানদার বান্দাগণ কিয়ামাত দিবসে তেমন কোন জেরার সম্মুখীন হবেন না। তাঁদের মর্যাদা অনুযায়ী তাঁদের বিচার অতি দ্রুত শেষ হয়ে যাবে, অর্থাৎ কিয়ামাত দিবস তাঁদের কাছে অপেক্ষাকৃত ছোট মনে হবে। পুণ্যবান বান্দাগণকে সে দিন ফিরিশতারা অভিবাদন জানাবেন, এমনকি পৃথিবীতে থাকা অবস্থায়ও তাঁরা ফিনিশতাগণের দু'আ ও আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে আশ্বাস লাভ করে থাকেন (যদিও তাদেরকে মানুষ চাক্ষুস দেখতে পায় না)। মহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন,

يٰعِبَادِ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ.

৪৩:৬৮। (আল্লাহ্ তাদেরকে বলবেন), 'হে আমার (অনুগত) বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই, কিংবা তোমরা বিষাদক্লিষ্টও হবে না।'

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ.

৪৩:৬৯। (এরা সে সব লোক) যারা *আমাদের* নিদর্শনসমূহের প্রতি বিশ্বাস এনেছিল এবং (আমার ইচ্ছার প্রতি) আত্মসমর্পণ করেছিল।

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ.

৪৩:৭০। (তাদেরকে বলা হবে), 'তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর।'

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى ۙ اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ.

২১:১০১। (পুণ্যবানগণ), যাদের জন্য আমার নিকট থেকে (ভাল আমলের কারণে) পূর্ব থেকেই কল্যাণ নির্ধারিত হয়ে আছে, তাদেরকে ওখান (জাহান্নাম) থেকে দূরে রাখা হবে।

لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمْ فِىْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ.

২১:১০২। তারা ওখানকার (আগুন ও আর্তনাদের) ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না,

এবং (জান্নাতে) তাদের মন যা চায় চিরকাল তা তাদের (ভোগের) জন্য (উপস্থিত) থাকবে।

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ط هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ.

২১:১০৩। (কিয়ামাত দিবসের) মহাভীতি তাদেরকে বিষাদক্লিষ্ট করবে না এবং ফিরিশতাগণ তাদেরকে (এই বলে) অভ্যর্থনা করবে, 'এই হচ্ছে তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।'

'আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "পুনরুত্থানের দিন যার হিসাব (বিস্তারিতভাবে) নেয়া হবে সে-ই প্রকৃতপক্ষে শাস্তিতে নিপতিত হবে। আমি বললাম, মহান আল্লাহ্ কি বলেননি, 'তার (ডান হাতে আমলনামা প্রাপ্ত ব্যক্তির) হিসাব নিকাশ সহজেই নেয়া হবে' (আয়াত ৮৪:৮)? তদুত্তরে তিনি বললেন, '(এর নিহিতার্থ) প্রকৃত হিসাব নয়, বরং তার কর্মফলের বিবরণ তার কাছে উপস্থাপন করা। যাকে বিস্তারিত ও সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করা হবে সে-ই শাস্তি প্রাপ্ত হবে।" মুসলিম- ৬৮৭১।

মহাবিচারের চূড়ান্ত রায় প্রক্রিয়া : বিচারের দাড়িপাল্লা স্থাপন, মলিন ও আলোকিত মুখের মানুষের বাছাই।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

১৬:১১১। (স্মরণ করো সেই দিনকে), যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি উপস্থিত করতে (এগিয়ে) আসবে এবং প্রত্যেককেই তার কৃতকর্মের পূর্ণ ফল দেয়া হবে এবং তাদের (কারো) প্রতি কোন অবিচার করা হবে না।

২১:৪৭। কিয়ামাতের দিন *আমরা* স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদণ্ড, সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না, এবং (কারো কোন) কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও তা *আমরা* (হিসাবের জন্য) উপস্থিত করব; আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে (তো) *আমরাই* যথেষ্ট।

(অনুরূপ: ৪:৪০, ১৮:৪৯, ৩১:১৬)

ইহজগতে মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার হক এবং বান্দার হক উভয়ই আদায় করতে হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হক আদায় না করার কারণে অর্জিত অনেক

পাপই শেষ বিচারের দিন মার্জনা করে দেবেন, কিন্তু মানুষের হক তিনি নিজে থেকে মাফ করবেন না, বরং তা যার কাছে প্রাপ্য তার কাছে থেকে আদায় করে যার প্রাপ্য তাকে দান করে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবেন।

এ সম্পর্কে হাদীসে আছে, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নু উনায়েস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, 'কিয়ামাতের দিন সমস্ত বান্দাদের সামনে ঘোষণা করা হবে, যা নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সবাই সমানভাবে শুনতে পাবে, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, 'আমি মালিক, আমি বিনিময় প্রদানকারী। ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জাহান্নামী জাহান্নামে যাবে না যতক্ষণ না আমি তার ঐ হক আদায় করে দেবো যা কোন জান্নাতীর জিম্মায় রয়েছে। আর কোন জান্নাতী ও জান্নাতে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার ঐ প্রাপ্য আদায় করে দেবো যা কোন জাহান্নামীর জিম্মায় রয়েছে। ঐ হক বা প্রাপ্য যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন।' (হাদীসটি তাফসীর ইবনে কাসীরে ১৮:৪৯ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুসনাদে আহ্‌মাদ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে)।

সেদিন যেহেতু সবাই উলঙ্গ ও রিক্তহস্ত থাকবে, তথা প্রাপ্য আদায় করার কোন ক্ষমতা থাকবে না, তাই হক নষ্টকারীর পুণ্য কেটে নিয়ে তা প্রাপককে দান করা হবে। আর হক নষ্টকারীর পুণ্য আদৌ না থাকলে প্রাপকের পাপ থেকে পাপ কেটে তা তার পাপে যোগ করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

১০১:৬। তখন যার (সৎকর্মের) পাল্লা ভারী হবে,

১০১:৭। সে লাভ করবে সুখ ও সন্তুষ্টির জীবন।

১০১:৮। কিন্তু যার (সৎকর্মের) পাল্লা হাল্কা হবে,

১০১:৯। তার বাসস্থান হবে (জাহান্নামের) অতল গর্ভ গর্তের ('হাবিয়া'র) মধ্যে।

১০১:১০। আর তুমি কি জান তা কি?

১০১:১১। (তা হচ্ছে) প্রজ্জ্বলিত (ও ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত) এক অগ্নিকুণ্ড।

(অনুরূপঃ ৭:৮-৯, ২৩:১০২-১০৩ ইত্যাদি)

৬:১৬। সে দিন যাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করা হবে (তা কেবল এই কারণে হবে যে), আল্লাহ্ তাকে অনুগ্রহ করবেন, আর এটি হবে সে দিনের সুস্পষ্ট সাফল্য।

উমার ইব্‌নু আ'স (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'কিয়ামাতের দিন

আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের মধ্য থেকে একটি লোককে দেখাবেন যে, তার আমলনামায় শুধু পাপই আছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, 'তোমার কোন ওজর বা পুণ্য আছে?' সে উত্তর দেবে ওজরও নেই পুণ্যও নেই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমলনামার কাগজে একটি পুণ্য আছে - (তার ঈমান ছিল এবং সে বলত), "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল"। লোকটি বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার আমলনামার এই একটি মাত্র কাগজ আমার এত পাপের মোকাবিলায় কি করতে পারে? আল্লাহ্ তা'আলা উত্তর দিবেন, 'তুমি নিশ্চয় অত্যাচারিত হবে না'। তখন ঐ কাগজ খণ্ডের ওজনে পাল্লাটি নীচের দিকে চলে যাবে এবং পাপের পাল্লাটি বিশাল পাপের লিপিসহ উপরে উঠে যাবে। - আহমাদ, ইবনে মাজা ও তিরমিযী।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

৩:১০৬। সে দিন (স্বীয় আমলনামা দেখে) কিছু লোকের মুখ হবে আলোকোজ্জ্বল, আর কিছু মুখ হবে (বিষাদে) কালো; যাদের মুখ হবে কালো তাদেরকে বলা হবে, 'তোমরা কি ঈমান আনয়নের পর কুফরীতে লিপ্ত হয়েছিলে? অতএব তোমাদের কৃত কুফরীর প্রতিফল হিসাবে (এই) শাস্তি ভোগ কর।'

৩:১০৭। আর যাদের চেহারা হবে আলোকিত, তারা থাকবে আল্লাহ্র রহমতের ছায়াতলে, তারা সেখানে থাকবে চিরকাল।

৫০:২১। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি (আল্লাহ্র আদালতে) হাযির হবে, তার সঙ্গে থাকবে একজন (ফিরিশতা) চালক (হিসেবে) এবং একজন (ফিরিশতা) সাক্ষী (হিসেবে)।

৫০:২২। (তাকে বলা হবে), এই দিবস সম্বন্ধে তুমি ছিলে উদাসীন, এখন *আমরা* তোমার (চোখের) সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে ফেলেছি; আজ তোমার দৃষ্টিশক্তি প্রখর।

৫০:২৩। আর তার সঙ্গী (ফিরিশতা) বলবে, এই হচ্ছে (তার) আমলনামা, আমার কাছে প্রস্তুত আছে।

৫০:২৪। (ফিরিশতাদ্বয়কে আদেশ করা হবে), 'নিক্ষেপ কর তোমরা জাহান্নামে প্রত্যেক ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারী অবিশ্বাসীকে -

৫০:২৫। যারা কল্যাণকর কাজে বাধা দিত, সীমালঙ্ঘন করতো এবং (আল্লাহ্র নির্দেশে) সন্দেহ পোষণ করত।

৫০:২৬। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যকে গ্রহণ করতো, তাকে (ও) কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করো।

রায় ঘোষণা : আমলনামা তুলে দেয়া হবে পুণ্যবানদের ডান হাতে এবং পাপীদের বাম হাতে

কিয়ামাতের দিন যাদের প্রথম বিচার হবে :

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, শেষ বিচারের দিন মানুষের মধ্যে যে জিনিসটির প্রথম ফায়সালা হবে তা হবে রক্তপাত (খুন-খারাবী) সংক্রান্ত। মুসলিম - ৪১৫৮।

অন্য বর্ণনায় আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, কিয়ামাতের দিন প্রথমে যার বিচার করা হবে তিনি একজন শহীদ। দুনিয়ায় প্রাপ্ত নিয়ামাতসমূহের বিনিময়ে সে কি করেছে, আল্লাহ্ তা'আলার এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য শহীদ হয়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, লোকে তোমাকে বীরপুরুষ বলবে এজন্য তুমি লড়েছ এবং লোকে তাই বলেছে। তৎপর তাকে উপুড় করে টেনে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হবেন অনুরূপ একজন রিয়াকার (লোক দেখানো) আলিম, যিনি লোকে তাকে আলিম ও ক্বারী বলবে এই জন্য ইল্‌ম শিক্ষা করেছেন এবং তৃতীয় ব্যক্তিও একজন রিয়াকার দানশীল লোক, তাকে সবাই দানবীর বলবে এই জন্যই তিনি দান করতেন। এই দুইজনও দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। - মুসলিম -৪৬৮৮ এর সার-সংক্ষেপ।

ন্যায় বিচারক আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

১৭:৭১। সেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতাসহ ডাকব : যাদের ডান হাতে তাদের আমলনামা দেয়া হবে তারা (খুসী মনে) তাদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও অবিচার করা হবে না।

৮৪:৭। যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে,

৮৪:৮। তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেয়া হবে,

৮৪:৯। এবং সে তার স্বজনদের নিকট প্রফুল্লচিত্তে ফিরে যাবে।

৮৪:১০। কিন্তু যাকে তার আমলনামা তার পিছন দিক থেকে (হাতকড়া পরানো বামহাতে) দেয়া হবে,

৮৪:১১। সে শীঘ্রই তার ধ্বংস আহ্বান করবে,

৮৪:১২। এবং জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।

যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তারা হচ্ছেন পুণ্যবান ঈমানদারগণ। তাদের ছোটখাটো পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, ফলে হিসাব করার মত তাদের আর কিছু থাকবে না, আনুষ্ঠানিকতার মত তাদের ডান হাতে আমলনামা হস্তান্তর করা হবে মাত্র। তাদের হিসাব তাই সহজ এবং অতি অল্প সময়ে শেষ হয়ে যাবে।

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, '(কিয়ামাতের দিন) যার হিসাব (সূক্ষ্ম ও বিস্তারিতভাবে) যাচাই হবে, শাস্তি তার জন্য অবধারিত।' অর্থাৎ বাম হাতে আমলনামা প্রাপ্ত (পাপী)-দেরই বিচার দীর্ঘ হবে, যাতে তারা তাদের সকল অপকর্মের হিসাব দেখতে পায়, আত্মরক্ষার সুযোগ পায় এবং কোন প্রকার অজুহাত দেখানোর উপায় তাদের না থাকে, কিংবা বলতে না পারে যে, তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। (হাদীসটি তাফসীর ইবনে কাসীরে ৮৪:৭ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুসনাদে আহমাদ ও বুখারী থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত মুসলিম - ৬৮৭১ নং হাদীসের বর্ণনাও অনুরূপ)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ.

৬৯:২৫। যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে, 'হায়! যদি আমাকে আমার আমলনামা দেওয়াই না হতো!'

وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ.

৬৯:২৬। এবং যদি আমার হিসাব আমি (কখনো) না জানতাম',

يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ.

৬৯:২৭। 'হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার (সব কিছুর চূড়ান্ত) শেষ হত!

مَآ اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ.

৬৯:২৮। 'আমার ধনসম্পদ তো (আজ) আমার কোনই কাজে আসল না,

هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطٰنِيَهْ.

৬৯:২৯। 'আমার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বও (আজ) নিঃশেষ হয়ে গেছে!

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ.

৬৯:৩০। (ফিরিশতাদেরকে কড়া নির্দেশ দেয়া হবে), 'তাকে পাকড়াও করো এবং তার গলায় শিকল পরিয়ে দাও, -

ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ.

৬৯:৩১। তারপর তাকে (জাহান্নামের) জ্বলন্ত আগুনে পোড়াও,

ثُمَّ فِىْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ.

৬৯:৩২। 'তদুপরি তাকে সত্তর হাত দীর্ঘ এক শিকল দিয়ে শৃঙ্খলিত করে রাখো।

اِنَّهٗ كَانَ لَايُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ.

৬৯:৩৩। (কেননা) সে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নি।

يٰاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ.

৮৯:২৭। (অপর দিকে পুণ্যবানকে বলা হবে) 'হে প্রশান্ত চিত্ত!

ارْجِعِىْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً.

৮৯:২৮। 'তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে ফিরে এসো, সন্তুষ্ট চিত্তে এবং (তাঁর) সন্তোষভাজন হয়ে,

فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ.

৮৯:২৯। আমার (অনুগত) বান্দাদের দলে শামিল হয়ে যাও,

وَادْخُلِي جَنَّتِي.

৮৯:৩০। আর আমার জান্নাতে (চিরকালের জন্য) প্রবেশ কর।

মহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'আলা ৪৩:৭৬ এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতে পাপীদের সম্পর্কে বলেন, "আমরা তাদের প্রতি যুলুম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিল যালিম (অবাধ্য ও মুশরিক)।" অর্থাৎ দুষ্কার্যের মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি রাসূল পাঠিয়েছিলাম, কিতাব নাযিল করেছিলাম এবং যুক্তি-প্রমাণ কায়েম করেছিলাম। কিন্তু তারা তাদের হঠকারিতা, অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত হয়নি। ফলে আমি তাদেরকে এর প্রতিফল দান করেছি। এটা তাদের প্রতি আমার যুলুম নয়, আমি তো আমার বান্দাদের প্রতি মোটেই যুলুম করি না।

রায় শেষে চূড়ান্ত গন্তব্যের পথে মানব জাতির পদযাত্রা

বিচারের পর পুলসিরাত অতিক্রম :

মহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'আলা ১৯:৭১ আয়াতে বলেন, "এবং তোমাদের প্রত্যেককেই ওটা (জাহান্নামের উপর স্থাপিত সেতু বা পুলসিরাত) অতিক্রম করবে। এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।" সহীহ্ মুসলিম শরীফের একাধিক সুদীর্ঘ হাদীসে (৩৪৮, ৩৫১ ইত্যাদি) আছে, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সবাইকে জাহান্নাম অতিক্রম করার জন্য যার যার উপাস্যকে অনুসরণ করতে বলা হবে। সকল স্থায়ী জাহান্নামী তথা কাফির ও মুশরিক তাদের নিজ নিজ উপাস্যকে অনুসরণ করতে থাকবে এবং তৃষ্ণার্ত হয়ে পানি চাইবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের মরীচিকার দিকে জমায়েত করা হলে তারা তথায় ঝাঁপিয়ে পড়বে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, পুলসিরাত এমন একটি স্থান বা রাস্তা যেখানে পা পিছলে যায়। সেখানে আছে নানা প্রকারের লৌহ শলাকা ও কাঁটা। পুণ্যবানদের জন্য এটা প্রশস্ত মনে হবে, পাপীদের কাছে এটা হবে চুল হতে সূক্ষ্ম এবং ক্ষুর হতে ধার। মু'মিনগণের কেউ এ পথ পলকের মধ্যে, কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ বায়ুর গতিতে, কেউ অশ্ব গতিতে, কেউ উষ্ট্রের গতিতে অতিক্রম করবে।

মু'মিনগণের যাদের পাপের পাল্লা ভারী তারা কাঁটাবিদ্ধ অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে এবং যতদিন পর্যন্ত না তাদের প্রাপ্য শাস্তি শেষ হয় ততদিন তারা জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। যার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান ছিল সেও শেষ পর্যন্ত

জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। (মূল হাদীসের একাংশের সার সংক্ষেপ)। (সহীহ বুখারীর অনুরূপ সুদীর্ঘ হাদীস ৯.৫৩২ ক, খ ও গ দ্রষ্টব্য)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

৫৭:১২। সেদিন তুমি দেখতে পাবে ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীগণকে, - তাদের সম্মুখ দিয়ে এবং তাদের ডানপাশ দিয়ে তাদের জ্যোতি (সাথে সাথে) ছুটতে থাকবে (আর চতুর্দিক থাকবে অন্ধকার); তাদেরকে বলা হবে, 'আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ (সেই) জান্নাতের, যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, সেখানে তোমরা অবস্থান করবে চিরকাল, - আর সেটাই হচ্ছে পরম সাফল্য'।

৫৭:১৩। সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মু'মিনগণকে বলবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের আলো থেকে কিছু আলো নিতে পারি।' তাদেরকে বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের পেছনদিকে ফিরে যাও, তৎপর (যেখানে পারো) আলোর সন্ধান করো।' অতঃপর উভয়দলের মাঝখানে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর, যাতে একটি দরজা থাকবে, এর অভ্যন্তরে (সর্বত্র) বিরাজ করবে (আল্লাহ্‌র) রহমত এবং বাহিরের দিকে থাকবে (কঠিন) আযাব।

৫৭:১৪। তারা (বাহিরের মুনাফিকরা ঈমানদারদেরকে) ডেকে বলবে, 'আমরা কি (দুনিয়ার জীবনে) তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' (ভিতর থেকে মু'মিনগণ) বলবে, হাঁ (ছিলে), কিন্তু তোমরা নিজেরাই তো নিজেদেরকে (বিপথে চালিত করে) বিপদগ্রস্ত করেছ। তোমরা (আমাদের অমঙ্গলের) প্রতীক্ষায় ছিলে, তোমরা (এই দিন সম্পর্কে) সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং তোমাদের অলীক আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত না (তোমাদের শাস্তির ব্যাপারে) আল্লাহ্‌র হুকুম এসে গেলো এবং মহাপ্রতারক (শয়তান) তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতারিত করেছিল।'

আ'রাফবাসী : (যাদের পাপ ও পুণ্য সমান সমান)

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলছেন,

৭:৪৬। এই উভয় (জান্নাতী ও জাহান্নামী)-এর মধ্যে থাকবে একটি (পার্থক্যকারী) পর্দা, আর কিছু লোক থাকবে আল-আ'রাফের (একটি উঁচু দেয়ালের) উপর, যারা (জান্নাত ও জাহান্নামের) সকল লোককে তাদের লক্ষণ

(যথাক্রমে উজ্জ্বল ও মলিন চেহারা) দ্বারা চিনতে পারবে এবং জান্নাতবাসীদিগকে সম্বোধন করে বলবে 'সালামুন আলাইকুম' (তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক')। তারা (আ'রাফের উপর অবস্থানকারীরা) তখনও জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু তারা অবশ্যই তথায় প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা করে।

৭:৪৭। আর যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামীদের প্রতি ফিরানো হবে, তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যালিম (পাপী) সম্প্রদায়ের সাথী করো না।'

(আরো দেখুন - ৭:৪৮ ও ৭:৪৯)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'দাঁড়িপাল্লা তো একটি শস্য দানার পার্থক্যের কারণে নীচে বসে যায় অথবা উপরে চড়ে উঠে।' তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'যাদের পাপ-পুণ্য সমান সমান হয়ে যাবে তারা কোথায় থাকবে?' উত্তরে তিনি (সা) বলেছিলেন, "এরাই হচ্ছে আ'রাফবাসী। তাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করানো হবে না তাদের পাপের কারণে এবং তাদের পুণ্য তাদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে। তবে তারা জান্নাতে প্রবেশের আশা অবশ্যই করবে। তারা জান্নাতবাসী ও জাহান্নামীদের দেখে চিনতে পারবে।" অতঃপর আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহে তারা জান্নাতের মিসকীনরূপে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

জাহান্নাম ও জান্নাতের প্রবেশদ্বারে যথাক্রমে পাপীদের তিরস্কার ও পুণ্যবানদের অভিবাদন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ط حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ط قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ.

৩৯:৭১। অবিশ্বাসীদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জাহান্নামের নিকটে উপস্থিত হবে তখন তার প্রবেশদ্বারগুলি খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে কোন রাসূল আসেননি, যারা তোমাদের নিকট তোমাদের

প্রতিপালকের (নির্দেশ ও) নিদর্শনসমূহ পাঠ করে শুনাত এবং এই দিনের (তাঁর সাথে) সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করত?' তারা বলবে, ' হাঁ, অবশ্যই এসেছিল, কিন্তু (অবিশ্বাস করার কারণে) কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির রায় আজ সত্য প্রমাণিত ও (বাস্তবায়িত) হয়ে গেছে।'

قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ج فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ.

৩৯:৭২। তাদেরকে বলা হবে, 'জাহান্নামের দরজা দিয়ে তোমরা প্রবেশ কর, সেখানেই চিরকাল থাকার জন্য : ঔদ্ধত্যপ্রকাশকারীদের জন্য যথার্থই নিকৃষ্ট একটি আবাসস্থল!

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ.

৬৭:৭। যখন তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তারা সেখানকার বিকট শব্দ শুনতে পাবে, আর তা হবে প্রজ্জ্বলিত লেলিহান (শিখা)।

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ط كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ.

৬৭:৮। রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে : যখনই কোন দলকে তাতে নিক্ষেপ করা হবে তখন তার রক্ষীরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী (নবী) আসেনি?'

قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ لا فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ج اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ.

৬৭:৯। তারা বলবে, 'হাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী অবশ্যই এসেছিল, কিন্তু আমরা তাদেরকে (মিথ্যাবাদী বলে) অস্বীকার করেছিলাম এবং বলেছিলাম, 'আল্লাহ্ কোন কিছুই (কোন ওহী) অবতীর্ণ করেননি, (বরং) তোমরাই চরম বিভ্রান্তিতে রয়েছ।'

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ.

৬৭:১০। এবং তারা আরো বলবে, 'যদি আমরা (নবীদের কথা) শুনতাম অথবা

বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তা হলে (আজ) আমরা জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না।'

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ج فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ.

৬৭:১১। তৎপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে, (ততক্ষণে ক্ষমার সুযোগ আর নেই) - ধিক্কার জাহান্নামবাসীদের উপর!

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ط حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ.

৩৯:৭৩। আর যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে নিয়ে যাওয়া হবে জান্নাতের দিকে। যখন তারা সেখানে উপস্থিত হবে এবং জান্নাতের দ্বারসমূহ খোলে দেয়া হবে এবং সেখানকার রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! তোমরা ভাল ফল (অর্জন) করেছ, অতএব এখানে প্রবেশ করো চিরকাল বাস করার জন্য।'

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ج فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ.

৩৯:৭৪। তারা (প্রবেশ করে) বলবে, 'সমগ্র প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন এবং আমাদেরকে এই (জান্নাতের) ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন; (এখন) আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে বসবাস করব।' সৎকর্মীদের (এই) পুরস্কার কতই উত্তম! (অনুরূপ আয়াত - ৩৫:৩৪ - ৩৫)

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ج وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

৩৯:৭৫। আর তুমি ফিরিশতাদেরকে দেখতে পাবে, তারা আরশের চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে এবং

(সেদিন) তাদের সকলের মধ্যে পূর্ণ ন্যায়ের সাথে বিচার করা হবে এবং (চতুর্দিকে) ধ্বনিত হবে, 'সকল প্রশংসা (কেবল) আল্লাহ্ তা'আলার (প্রাপ্য) যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালক।' [অনুরূপ পাঠ্য : ৫০:৩০ ~ ৫০:৩৫]

وَقَالُوْا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰىنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَاۤ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ.

৭:৪৩। .....আর তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদেরকে এর (জান্নাতের) জন্য হিদায়াত দান করেছেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে হিদায়াত না করলে আমরা হিদায়াত লাভ করতাম না.....। (অনুরূপ - ৩৫:৩৪ - ৩৫)

কিয়ামাতের দিন সত্তর হাজার মুসলিম বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে :

ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "আমার উম্মাহ্র সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর তারা হচ্ছে ঐসব (ঈমানদার) লোক যারা ঝাঁড়ফুঁক করায় না (বা করে না), কিংবা কোন জিনিসের মাধ্যমে শুভ-অশুভ নির্ধারণ করে না এবং তারা তাদের প্রভুর উপর নির্ভর করে।" বুখারী ৮.৪৭৯ (বুখারী ও মুসলিমে আরো আট-নয়টি হাদীসে অনুরূপ বর্ণনা আছে)।

কিয়ামাতের দিন মৃত্যুর 'মৃত্যু' ঘটানো হবে :

কিয়ামাতের পরের জীবন যেহেতু অনন্ত, সে জন্য কিয়ামাতের দিনই আল্লাহ তালা প্রাণীর 'মৃত্যু' প্রক্রিয়াটির সমাপ্তি ঘটাবেন অর্থাৎ মৃত্যুরই সেদিন মৃত্যু হবে এবং সেদিন থেকে মানব ও জ্বিন অনন্তকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবে।

সহীহ্ বুখারী (৬.২৫৪)-তে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, কিয়ামাতের দিন 'মৃত্যু'কে একটি সাদা-কালো মেষের আকৃতিতে উপস্থিত করে তাকে যবাই করে দেয়া হবে। ফলে জাহান্নামের অধিবাসীদের দেহ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলে কিংবা দেহের মাংস গলে গেলেও তাদের দেহে আবার নূতন মাংস লাগিয়ে দেয়া হবে, কিন্তু মৃত্যুর আকাজ্ক্ষা করেও তারা মরবে না। অপর দিকে জান্নাতবাসীগণ থাকবে চির যৌবন প্রাপ্ত হয়ে; তাদেরকে রোগ, শোক বা জরা কখনও আক্রান্ত করবে না এবং মৃত্যুর স্বাভাবিক কারণসমূহই (যা এ জগতে থাকে) তাদের থেকে অনুপস্থিত থাকবে। তারা মৃত্যুর আশংকামুক্ত হয়ে নিশ্চিন্তে জান্নাতের সুখ উপভোগ করতে থাকবেন। (মুসলিম - ৬৮২৭ অনুরূপ)

৩.৫। মানব জীবনের শেষ ও চূড়ান্ত অধ্যায় : অনন্ত জীবনের চিরস্থায়ী ঠিকানা

বিচার শেষে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মানব জাতিকে প্রধান তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করবেন। কুরআনের ভাষায় প্রথম দলকে বলা হচ্ছে 'অগ্রবর্তী' দল তথা বিশ্বাস ও সৎকর্মে যাদের স্থান সর্বোচ্চে এবং যারা আল্লাহ্র সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী, বিশ্বস্ত ও অনুগত বান্দা। স্পষ্টতঃ এরা হচ্ছেন নবী, রাসূল, শহীদ ও আউলিয়াগণ এবং প্রথম শ্রেণীর জান্নাতবাসী। দ্বিতীয় দলকে আখ্যা দেয়া হয়েছে 'ডান দিকের' দল। এরা সেই সব ঈমানদার ব্যক্তি যারা পাপমুক্ত ছিলেন না, কিন্তু পুণ্যের পরিমাণ বেশী হওয়ায় অথবা আল্লাহ্ গাফুরুর-রাহীম তাদের বেশীর ভাগ পাপ ক্ষমা করে দেয়ায় তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 'দ্বিতীয় শ্রেণীর' জান্নাতের বাসিন্দা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এই উভয় শ্রেণীর মধ্যেই প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পুণ্যের পরিমাপ অনুযায়ী জান্নাতে তাদের নিজেদের 'সুযোগ-সুবিধা' বা শ্রেণী-বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য থাকবে বৈকি। তৃতীয় দল হচ্ছে 'বাম দিকের' দল বা জাহান্নামী। এদের মধ্যে মুশরিক, মুনাফিক, কাফির ও বিভিন্ন স্তরের অন্যান্য পাপীরা অন্তর্ভুক্ত।

মুশরিক, মুনাফিক ও কাফিররা হবে জাহান্নামের চিরকালের অধিবাসী। অন্যান্য পাপীদের মধ্যে যাদের আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস ছিল, অথচ পুণ্যের পরিমাপ পাপের বোঝার তুলনায় ছিল নগণ্য, তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে বটে, তবে পাপের পরিমাণ অনুযায়ী একটি মেয়াদ পর্যন্ত (যা হাজার হাজার বৎসর হতে পারে) শাস্তি ভোগ করে আল্লাহ্র ক্ষমা লাভ করে সেখান থেকে মুক্তি পাবে বলে আশা করা হয় (পরবর্তী এক পরিচ্ছেদে আয়াত ১১:১০৭ দ্রঃ)। তবে জাহান্নামের শাস্তি এতই ভয়ঙ্কর যে, সেখানে অল্পক্ষণ থাকাও ইহকালের সকল মিলিত কষ্টেরও অধিক! (যারা জাহান্নামের আগুনের 'তোয়াক্কা' বা বিশ্বাস করেন না তারা মাত্র এক মুহূর্তের জন্য তাদের শরীরের কোন অংশ জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করিয়ে দেখতে পারেন!)

পরকালে মানব জাতিকে তিনটি বিশেষ দলে বিভক্ত করা হবে :

মহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

৫৬:৭। এবং (সেদিন) তোমাদেরকে তিনটি দলে বিভক্ত করা হবে,-

৫৬:৮। তৎপর (একটি হবে) ডান দিকের দল; কী (ভাগ্যবান) হবে ডান দিকের দল!

৫৬:৯। আর (একটি হবে) বাম দিকের দল; কী (হতভাগ্য) হবে বাম দিকের দল!

৫৬:১০। এবং (ঈমানে ও আমলে) অগ্রবর্তীগণই হবে সকলের অগ্রবর্তী।

ডান দিকের দল - সাধারণ জান্নাতীগণ, যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে।

[বাম দিকের দল - জাহান্নামীদের দল, যাদের বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে।

অগ্রবর্তী দল - জান্নাতবাসীগণের মধ্যে সবচাইতে মর্যাদাবানগণ ও নেতৃস্থানীয়রা তথা নবী, রাসূল, সিদ্দীক ও শহীদগণ]।

অগ্রবর্তী দলের অবস্থা :

৫৬:১১। এরাই হবে (আল্লাহ্ তা'আলার) সর্বাপেক্ষা নৈকট্যপ্রাপ্ত,

৫৬:১২। (তারা থাকবে) অনন্দময় উদ্যানে (জান্নাত-এ-না'ঈম);

৫৬:১৩। (তাদের মধ্যকার) বহুসংখ্যক হবে পূর্ববর্তীকালের লোকদের মধ্য থেকে;

৫৬:১৪। এবং অল্পসংখ্যক হবে পরবর্তীকালের লোকদের মধ্য থেকে।

৫৬:১৫। (তারা আসীন হবে) স্বর্ণ-খচিত আসনে,

৫৬:১৬। তাতে হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে,

৫৬:১৭। তাদের চারপাশে (তাদের সেবা করার জন্য) চিরকিশোররা ঘোরাফেরা করবে,

৫৬:১৮। পানপাত্র, কুঁজা এবং খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে।

৫৬:১৯। সেই সুরাপানে তাদের শিরঃপীড়া হবে না কিংবা তারা জ্ঞানহারা হবে না (যা হয়ে থাকে পৃথিবীর সুরা পান করলে),

৫৬:২০। আরো থাকবে তাদের পছন্দমত (বেছে নেয়ার) ফলমূল,

৫৬:২১। আর (রকমারি) পাখির গোশ্ত, তাদের মনের চাহিদামত।

৫৬:২২। এবং (তাদের সঙ্গ দিতে থাকবে) সুনয়না হুর (তরুণীবৃন্দ)।

৫৬:২৩। (যারা) সুরক্ষিত মুক্তার মত (আকর্ষণীয়)।

৫৬:২৪। (এ সব কিছুই হবে) তাদের (ইহ জগতের) কর্মের পুরস্কার।

৫৬:২৫। সেখানে তারা কোন অসার কথাবার্তা অথবা পাপবাক্য শুনবে না, -

৫৬:২৬। (শুনবে) কেবল (আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আসা চির শান্তির) এই বাণী, 'সালাম! সালাম!' [অনুরূপ : ৩৬:৫৫ ~ ৩৬:৫৮ এবং ৩৭:৪০ ~ ৩৭:৫০]

ডান দিকের দলের অবস্থা :

৫৬:২৭। আর ডানদিকের দল, কী (ভাগ্যবান) হবে ডানদিকের দল!

৫৬:২৮। তারা থাকবে (এমন একটি উদ্যানে), সেখানে আছে কাঁটাবিহীন কুলগাছ,

৫৬:২৯। আর কাঁদি ভরা কলা গাছ,

৫৬:৩০। আর দূর সম্প্রসারিত ছায়া,

৫৬:৩১। এবং সদা প্রবাহমান (ঝর্ণার) পানি,

৫৬:৩২। ও পর্যাপ্ত ফল-মূল, -

৫৬:৩৩। যা (ঋতুভেদে) শেষ (বা সীমিত) হয়ে যাবে না, কিংবা (যার সরবরাহ বা ব্যবহার) নিষিদ্ধও হবে না।

৫৬:৩৪। আর (তারা আসীন থাকবে) উচ্চ (মর্যাদা ও সম্মানের) আসনে।

৫৬:৩৫। *আমরা* (তাদের সঙ্গিনী হুরগণকে) বিশেষ সৃষ্টিরূপে সৃষ্টি করেছি,

৫৬:৩৬। এবং তাদের করেছি (পবিত্র ও) চিরকুমারী,

৫৬:৩৭। (আর) প্রেমসোহাগিনী ও সমবয়স্কা, -

৫৬:৩৮। (এসব হচ্ছে) ডান দিকের লোকজনদের জন্য।

৫৬:৩৯। তাদের অনেকে হবে পূর্ববর্তীকালের (লোকদের) মধ্য থেকে,

৫৬:৪০। এবং অনেকে হবে পরবর্তীকালের (লোকদের) মধ্য থেকে।

বাম দিকের দলের অবস্থা :

৫৬:৪১। আর বাম দিকের দল, কী (হতভাগ্য) হবে বাম দিকের দল!

৫৬:৪২। তারা থাকবে (জাহান্নামের) অতি উত্তপ্ত বাতাস আর ফুটন্ত পানির মধ্যে, -

৫৬:৪৩। এবং (ঘন) কালো বর্ণের ধুঁয়ার ছায়ায়,

৫৬:৪৪। যা না হবে শীতল, আর না হবে আরামদায়ক,

৫৬:৪৫। (কেননা) এরাই ইতিপূর্বে (পৃথিবীতে) ভোগ-বিলাসে মগ্ন ছিল;

৫৬:৪৬। এবং তারা বিরামহীনভাবে ঘোরতর পাপকর্মে লিপ্ত থাকত,

৫৬:৪৭। আর বলতে থাকত, 'কী! আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়সমষ্টিতে পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি আমরা (জীবিত হয়ে) পুনরুত্থিত হবো?'

৫৬:৪৮। 'এবং (একইভাবে) আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণও?,

৫৬:৪৯। (হে রাসূল) বলুন, অবশ্যই (পুনরুত্থিত করা হবে) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল লোককে,

৫৬:৫০। সবাইকেই জড়ো করা হবে একটি সুবিদিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।

৫৬:৫১। অতঃপর, হে পথভ্রষ্ট ও (সত্যের বাণীকে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা! তোমরা অবশ্যই -

৫৬:৫২। নিশ্চিতভাবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে আহার করবে,

৫৬:৫৩। এবং তা দ্বারা তোমাদের উদর পূর্ণ করবে,

৫৬:৫৪। তৎপর তার উপর পান করবে অতি উত্তপ্ত (ফুটন্ত) পানি;

৫৬:৫৫। আর (তা) পান করবে মহাতৃষ্ণার্ত উটের ন্যায়।

৫৬:৫৬। শেষ বিচারের দিন এই হবে তাদের আপ্যায়ন!

জাহান্নামবাসী ও জান্নাতবাসীগণের অনন্ত জীবনের তুলনামূলক চিত্র :

প্রতিশ্রুত গন্তব্যে পৌঁছার পর অভিবাদন

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

৫৯:২০। জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসীরা (কখনো) সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই হচ্ছে সফলকাম।

৯:৭২। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (সেই) জান্নাতের - যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান, যেখানে তারা বাস করবে চিরকাল, আর (তাদের জন্য আছে) চিরস্থায়ী আনন্দের জান্নাতের (জান্নাত-এ-আদ্ন) মধ্যকার অতি উত্তম বাসস্থান। কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ (আনন্দ) এবং সেটাই হবে সর্বোৎকৃষ্ট সাফল্য।

১০:১০। সেখায় তাদের (মুখের) ধ্বনি হবে, 'হে আল্লাহ্! তুমি মহান, পবিত্র!' এবং সেথায় তাদের প্রতি অভিবাদন (জানানো) হবে, 'সালাম' (শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের প্রতি!) আর তাদের শেষ ধ্বনি হবে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র (প্রাপ্য), যিনি জগতসমূহের (সকল সৃষ্ট প্রাণী ও বস্তুর) প্রতিপালক।' (অনুরূপ ঃ ১৫:৪৫ ~ ১৫:৪৮)

৩৬:৫৮। তাদের প্রতি পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সম্ভাষণ হবে, 'সালাম।'

৫২:১১। দুর্ভোগ সেদিন (ঐ সকল) সত্য অস্বীকারকারীদের,

৫২:১২। যারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে,

৫২:১৩। সে দিন তাদেরকে ধাক্কা মেরে মেরে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে,

৫২:১৪। (তাদেরকে বলা হবে,) এই সেই আগুন যাকে তোমরা অস্বীকার করতে!

৩৬:৬৩। এই সেই জাহান্নাম, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেয়া হয়েছিল।

৩৬:৬৪। আজ তোমরা এতে প্রবেশ করো, কেননা তোমরা একে অবিশ্বাস করেছিলে।

যখন জাহান্নামী দলপতিরা তাদের অনুসারীদের জাহান্নামের দিকে আসতে দেখবে তখন বলবে,

৩৮:৫৯। 'এ হচ্ছে আরেকটি বাহিনী, (যারা) তোমাদের সাথে দ্রুত প্রবেশ করছে! এদের জন্য নেই কোন অভিনন্দন, এরা অবশ্যই জাহান্নামের আগুনে পুড়বে!'

৩৮:৬০। অনুসারীরা বলবে, 'বরং তোমরাও (একই অবস্থায়), তোমাদের জন্যও নেই কোন অভিনন্দন। তোমরাই তো আমাদের উপর এই বিপদ এনেছ, কী নিকৃষ্টই না এই আবাসস্থল!'

৬৭:৭। যখন তারা তাতে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তারা এর বিকট শব্দ শুনবে এবং তা (প্রজ্জ্বলিত অবস্থায়) গর্জন করতে থাকবে,

৬৭:৮। যেন ক্রোধে ফেটে পড়ছে; যখনই কোন দলকে তাতে নিক্ষেপ করা হবে তখন সেখানকার রক্ষীরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমাদের কাছে কি (জাহান্নামের ব্যাপারে) কোন সতর্ককারী আসেনি?'

৬৭:৯। তারা উত্তর দিবে, 'হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী (নবী) অবশ্যই এসেছিলেন, কিন্তু আমরা তাদেরকে (নবী হিসেবে মানতে) অস্বীকার করেছিলাম এবং বলেছিলাম, 'আল্লাহ্ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, বরং তোমরাই চরম বিভ্রান্তিতে আছ।'

৬৭:১০। এবং তারা আরো বলবে, 'যদি আমরা (তাদের কথা) শুনতাম, অথবা আমাদের বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তা হলে আমরা (এই) জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না।

৬৭:১১। অতঃপর তারা তাদের সকল অপরাধ স্বীকার করবে। ধিক জাহান্নামবাসীদের প্রতি (এখন আর তাদের মার্জনার পথ নেই)।

বাসস্থান ও সঙ্গীসাথী

১১:১০৬। অতঃপর যারা হতভাগ্য (পাপী) তারা থাকবে জাহান্নামের আগুনে, - সেখানে তাদের জন্য থাকবে কেবল (আযাবের) চীৎকার ও (যন্ত্রণার) আর্তনাদ।

১১:১০৭। তথায় তারা স্থায়ী থাকবে যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান

থাকবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন; নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক তাই বাস্তবায়ন করেন যা তিনি করতে চান।

(অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ চান তবে যে সকল পাপী আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস করত কিন্তু পাপে নিমগ্ন ছিল তাদেরকে কোন এক পর্যায়ে তিনি আপন দয়ায় জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন)। অনুচ্ছেদ ৩.৬ দ্রষ্টব্য।

১১:১০৮। পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যবান (পুণ্যবান) তারা থাকবে জান্নাতে, সেখানে তারা স্থায়ী থাকবে যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন; (তাদের জন্য) এ হবে এক নিরবচ্ছিন্ন (চিরস্থায়ী) পুরস্কার।

২০:৭৪। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য নিশ্চয় আছে জাহান্নাম, সেখানে সে (চাইলেও) মরবে না, আর (বাঁচার মত) বাঁচবেও না। (অনুরূপ ৩৫:৩৬)।

২০:৭৫। আর যারা তাঁর নিকট মু'মিন হিসেবে সৎকর্ম করে উপস্থিত হবে, তাদের জন্য আছে সমুচ্চ মর্যাদা, -

২০:৭৬। স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে প্রবাহিত আছে নদী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। - আর এই হচ্ছে তাদের জন্য পুরস্কার, যারা (পাপ থেকে) পবিত্র থেকেছে।

৪৩:৬৮। (আল্লাহ্ তাদেরকে বলবেন) হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা কোন দুঃখও পাবে না।

৪৩:৬৯। তোমরা যারা *আমাদের* নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করেছিল এবং আত্মসমর্পণ করেছিল (মুসলমান হয়েছিল) -

৪৩:৭০। তোমরা ও তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর।

৪৩:৭১। স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে, সেখানে তাদের জন্য সব কিছু মজুদ আছে, যা তাদের অন্তর চায় এবং যাতে তাদের নয়ন তৃপ্ত হয়। আর তোমরা এখানে চিরকাল থাকবে। (অতিরিক্ত পাঠ্য ঃ ৩৬:৫৫ ~ ৩৬:৫৭, ৪৩:৭২ ~ ৪৩:৭৮, ৭৬:১২ ~ ৭৬:১৪)।

পোশাক-পরিচ্ছদ, আপ্যায়ন, আহার্য ও পানীয়

পোশাক-পরিচ্ছদ

৪:৫৬। যারা *আমাদের* নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তাদেরকে অচিরেই আগুনে দগ্ধ করব, যখনই তাদের চর্ম পুড়ে যাবে, তখনই তার স্থলে নূতন চর্ম সৃষ্টি করব যাতে তারা শাস্তি আস্বাদন করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

১৪:৪৯। সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শৃঙ্খলিত অবস্থায়,

১৪:৫০। তাদের পোশাক হবে আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে আগুনে আচ্ছাদিত করে রাখবে।

২২:১৯। এরা দুটি বিবদমান পক্ষ (আল্লাহ্র অনুগত ও অবিশ্বাসী), তারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করে : যারা কুফরী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ফেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি,

২২:২০। যাদ্বারা তাদের উদরে যা আছে তা এবং তাদের চর্ম বিগলিত করা হবে,

২২:২১। এবং তাদের (শাস্তির) জন্য থাকবে লোহার তৈরী মুগুর।

২২:২২। যখনই তারা যন্ত্রণা কাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে সেখানে জোর করে ফিরিয়ে দেয়া হবে, (তাদেরকে বলা হবে), তোমরা দোযখের দহন যন্ত্রণা আস্বাদন করো।

৩৫:৩৩। (পুণ্যবানগণ) প্রবেশ করবে চিরস্থায়ী জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণনির্মিত ও মুক্তা খচিত কংকন দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। [অনুরূপ ৭৬:২১]

৩৫:৩৪। এবং তারা বলবে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করেছেন, নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালক ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী;

৩৫:৩৫। 'যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন, যেখানে ক্লেশ আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তিও আমাদেরকে স্পর্শ করে না।

৪৪:৫১। মুত্তাকীগণ থাকবে নিরাপদ আবাসে -

৪৪:৫২। উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে,

৪৪:৫৩। তারা মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র পরিধান করে (পরস্পরের) মুখোমুখি হয়ে বসবে।

৪৪:৫৪। এই হবে (তাদের পুরস্কার); আর *আমরা* আয়তলোচনা হুরদেরকে তাদের সঙ্গিনী করে দেবো,

৪৪:৫৫। সেখানে তারা প্রশান্তচিত্তে বিবিধ ফলমূল চাইবে।

৪৪:৫৬। (পৃথিবীতে) প্রথম মৃত্যুর পর সেখানে তারা আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। আর তাদেরকে তিনি (আল্লাহ্) জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন,

৪৪:৫৭। (এ হবে) তোমার প্রতিপালকের তরফ থেকে অনুগ্রহ, এটাই হচ্ছে মহাসাফল্য। (অনুরূপ ৭৮:৩১ ~ ৭৮:৩৬)।

৫১:১৫। নিশ্চয় আল্লাহ্ভীরুগণ (মুত্তাকী) থাকবে উদ্যান ও প্রস্রবণের মাঝে,

৫১:১৬। তাদের প্রতিপালক যা (পুরস্কার) দিবেন তা তারা উপভোগ করবে, কেননা ইতিপূর্বে (পার্থিব জীবনে) তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ;

৫১:১৭। রাত্রির সামান্য অংশই তারা নিদ্রায় অতিবাহিত করত, (অর্থাৎ বেশীর ভাগ সময় ইবাদাতে মগ্ন থাকত)।

৫১:১৮। আর রাত্রির শেষপ্রহরে তারা (প্রতিপালকের কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করত,

৫১:১৯। এবং তাদের ধন-সম্পদে অভাবগ্রস্ত প্রার্থী ও বঞ্চিত (অ-প্রার্থী)-দের অধিকার রয়েছে (বলে তারা স্মরণ রাখত অর্থাৎ দান খয়রাত করত)।

(অনুরূপ ঃ ৫০:৩১ ~ ৫০:৩৫)।

আহার্য ও পানীয় :

জাহান্নামীদের খাদ্য তালিকা : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

১৪:১৬। তাদের (উদ্ধত, স্বৈরাচারী কাফিরদের) প্রত্যেকের সামনে রয়েছে জাহান্নাম, (সেখানে) তাদেরকে পান করানো হবে গলিত পুঁজ (ও ফুটন্ত পানি),

১৪:১৭। সে (অনিচ্ছা সত্ত্বেও) অতি কষ্টে তা চুমুক করে পান করবে, কিন্তু কোনভাবেই তার পক্ষে তা গলাধঃকরণ করা সম্ভব হবে না; আর তার চতুর্দিক থেকে মৃত্যু আসবে, তথাপি তার মৃত্যুও ঘটবে না; এবং তার সামনে থাকবে একের পর এক কঠোর শাস্তি।

৩৭:৬২। আপ্যায়নের জন্য কি ঐসব (জান্নাতের নিয়ামাতরাজি) শ্রেয়, না যাক্কুম বৃক্ষ?

(ঐসব - তথা নীচে ৩৭:৪১ থেকে ৩৭:৬০ আয়াতে বর্ণিত জান্নাতের নিয়ামাতরাজি)

৩৭:৬৩। কেননা *আমরা* তা অবশ্যই অপরাধীদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ তৈরী করে রেখেছি,

৩৭:৬৪। এ এমন এক বৃক্ষ যা উদ্গত হয় জাহান্নামের তলদেশ থেকে,

৩৭:৬৫। এর মোচা যেন শয়তানের মাথা (কুৎসিত),

৩৭:৬৬। তারা (জাহান্নামীরা) এ থেকেই ভক্ষণ করবে এবং এ দিয়েই তাদের উদর পূর্ণ করবে,

৩৭:৬৭। তদুপরি তাদেরকে পান করার জন্য দেয়া হবে (যাক্কুম ও) ফুটন্ত পানির মিশ্রণ,

৩৭:৬৮। তৎপর অবশ্যই তাদের প্রত্যাবর্তন হবে (প্রজ্জ্বলিত) আগুনের দিকে।

[অনুরূপ ৩৮:৫৫ ~ ৩৮:৫৮]

৪৪:৪৩। নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হবে -

৪৪:৪৪। পাপীর খাদ্য;

৪৪:৪৫। গলিত তামার মত তাদের উদরে তা ফুটতে থাকবে,

৪৪:৪৬। ফুটন্ত পানির মত।

৪৪:৪৭। (ফিরিশতাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হবে) একে ধর এবং জাহান্নামের মাঝখানে নিয়ে যাও,

৪৪:৪৮। তার পর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে শাস্তি দাও -

৪৪:৪৯। (তাকে বলা হবে) আস্বাদন কর (এই শাস্তি), তুমি না ছিলে খুব শক্তিশালী, অভিজাত!

৪৪:৫০। এ হচ্ছে (সেই জাহান্নামের শাস্তি) যা সম্পর্কে তোমরা (বিশেষতঃ শক্তিশালীরা) সন্দেহ করতে!

[যাক্কুম বৃক্ষ সম্পর্কিত অনুরূপ আয়াত ঃ ৫৬:৫১ ~ ৫৬:৫৬]

৭৮:২১। নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎ পেতে আছে -

৭৮:২২। সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রত্যাবর্তনস্থল (হিসেবে)।

৭৮:২৩। সেখানে তারা যুগযুগ ধরে অবস্থান করবে,

৭৮:২৪। সেখানে তারা না আস্বাদন করবে কোন শীতল (পরিবেশ) আর না কোন পানীয়, -

৭৮:২৫। কেবল ফুটন্ত পানি ও দুর্গন্ধময় পুঁজ ব্যতীত,

৭৮:২৬। (পাপীদের) এ-ই হচ্ছে উপযুক্ত প্রতিফল। [অনুরূপ ৬৯:৩৩ ~ ৬৯:৩৭]

৮৮:৫। তাদেরকে পান করানো হবে অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ থেকে;

৮৮:৬। তাদের জন্য 'দারী'আ' নামক (শুষ্ক, বিষাক্ত, কণ্ঠকময়) গুল্ম ব্যতীত কোন খাদ্য থাকবে না,

৮৮:৭। যা তাদের পুষ্টিও যোগাবে না এবং ক্ষুধাও মিটাবে না।

জান্নাতীগণের আপ্যায়ন

৩৭:৪১। তাদের (আল্লাহ্‌র একনিষ্ট বান্দাদের) জন্য আছে নির্ধারিত রিয্‌ক -

৩৭:৪২। ফলমূল; এবং তারা হবে সম্মানিত,

৩৭:৪৩। নিয়ামতপূর্ণ কাননে, (জান্নাত আল্ না'য়ীম),

৩৭:৪৪। তারা (পরস্পরের) মুখোমুখি হয়ে (মর্যাদার) আসনে সমাসীন থাকবে,

৩৭:৪৫। তাদেরকে ঘুরে ঘুরে বিশুদ্ধ সুরাপূর্ণ পাত্রে পরিবেশন করা হবে -

৩৭:৪৬। শুভ্র-সমুজ্জ্বল (পানীয়), যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।

৩৭:৪৭। তাতে (মাদকতার মত) ক্ষতিকর কিছু থাকবে না এবং তার দ্বারা তারা মাতালও হবে না।

৩৭:৪৮। আর তাদের সঙ্গে থাকবে আনতনয়না, আয়তলোচনা কুমারী নারীগণ (হূর);

৩৭:৪৯। যেন (পাখির ডানার নীচে) সুরক্ষিত ডিম।

৩৭:৫০। তারা (জান্নাতবাসীরা) অতঃপর একে অপরের মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

৩৭:৫১। তাদের একজন (আলাপ শুরু করে) বলবে, '(পৃথিবীতে) আমার একজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিল,

৩৭:৫২। সে বলত, 'কি! তুমিও এতে (কিয়ামাতে) বিশ্বাসকারীদের একজন?'

৩৭:৫৩। '(এবং বিশ্বাস কর যে), আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হব তখন সত্যিই (পুনরুত্থিত করে) আমাদেরকে (আমাদের কৃতকর্মের) প্রতিফল দেয়া হবে?'

৩৭:৫৪। (আল্লাহ্) বলবেন, 'তোমরা কি (সেই লোককে) দেখতে চাও?'

৩৭:৫৫। তৎপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে জাহান্নামের মধ্যস্থলে দেখতে পাবে;

৩৭:৫৬। সে বলবে, 'আল্লাহ্র কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে ফেলেছিলে!'

৩৭:৫৭। (আমার প্রতি) আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও তো (জাহান্নামে) হাযিরকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম।

৩৭:৫৮। (এটা নিশ্চিত যে) আমাদের আর মৃত্যু হবে না?

৩৭:৫৯। কেবল আমাদের (পৃথিবীতে) প্রথম মৃত্যু ব্যতীত; এবং আমাদেরকে (কোন) শাস্তি দেয়া হবে না!'

৩৭:৬০। এটাই তো সর্বোত্তম সাফল্য!'

৪৭:১৫। মুত্তাকীগণ (আল্লাহ্ ভীরু)-কে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে : তাতে আছে নির্মল ঝর্ণাধারা, আছে দুধের (এমন) নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর ও বিশুদ্ধ মধুর ঝর্ণাধারা এবং সেখানে তাদের জন্য (আরো) আছে সব রকমের ফলমূল আর

(সর্বোপরি) তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মার্জনা। (যারা এমন সুখে থাকবে) তারা কি ঐ সব লোকের সাথে তুলনীয় যারা জাহান্নামের আগুনে চিরকাল থাকবে এবং যাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-ভিন্ন করে দিবে?

৭৬:৫। সৎকর্মশীলগণ পানপাত্র থেকে এমন পানীয় পান করবে যা হবে সুগন্ধিযুক্ত কর্পুর (কাফূর) মিশ্রিত-

৭৬:৬। (এই পানীয়) একটি প্রস্রবণ, যা থেকে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ পান করবে, (এবং) যা তারা যথা (কিংবা যে পরিমাণ) ইচ্ছা প্রবাহিত করবে।

৭৬:৭। (এরা সেইসব লোক) যারা 'মান্নত' (প্রতিশ্রুতি/নৈতিক কর্তব্য) পালন করে এবং সেই দিনের ভয় করে, যে দিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক।

৭৬:৮। আর এরা কেবল আল্লাহ্‌র ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অভাবগ্রস্ত, মাতৃ-পিতৃহীন ও বন্দীকে আহার্য দান করে,

৭৬:৯। (এই বলে যে) 'আমরা কেবল আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টি লাভের) জন্য তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট থেকে প্রতিদানও চাই না, আর (কোন রকম) কৃতজ্ঞতাও চাই না।.....

৭৬:১৫। তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে রৌপ্য নির্মিত থালায় এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পানপাত্রে, -

৭৬:১৬। রজতশুভ্র স্ফটিক পাত্রে, যা (পরিবেশনকারীরা) যথাযথ পরিমাণে পূর্ণ করবে।

৭৬:১৭। আর তাদেরকে সেখানে পান করতে দেয়া হবে যান্‌জাবীল (আদ্রক) মিশ্রিত পানীয়,

৭৬:১৮। যা সেখানকার এক প্রস্রবণ (থেকে), যার নাম সালসাবীল।

৭৬:১৯। তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করবে চিরকিশোরগণ, যখন তুমি তাদেরকে দেখবে তখন তুমি মনে করবে তারা যেন ছড়ানো মুক্তা।

৮৩:২৪। তাদের (জান্নাতবাসীদের) চেহারায় তুমি স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি সহজেই চিনতে পারবে,

৮৩:২৫। তাদেরকে ছিপি আঁটা (সীল করা পাত্রের) বিশুদ্ধ পানীয় থেকে পান করানো হবে,

৮৩:২৬। যার ছিপি মিস্‌কের (কস্তুরির সুগন্ধি দিয়ে) তৈরী, আর এর জন্য প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক;

৮৩:২৭। এর মিশ্রণ হবে তাস্‌নীমের (জান্নাতের বিশেষ পানীয়),

৮৩:২৮। এ (এমন) একটি প্রস্রবণ, যা থেকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করে।

জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পাপীদের শেষ প্রয়াস ও ব্যর্থতা

৩২:২০। আর যারা (আল্লাহ্‌র) নাফরমানী করেছে তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নামের আগুন, যখনই তারা তা থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে জোর করে সেখানে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, 'যে আগুনের শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলে অস্বীকার করতে, তার স্বাদ আস্বাদন করো।'

৩৫:৩৭। সেখানে তারা (নিষ্কৃতির জন্য) আর্তনাদ করে বলবে 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে (এখান থেকে) বের করে নাও, আমরা সৎকর্ম করব, পূর্বে যা করতাম তা (আর) করবো না।' (আল্লাহ্ বলবেন) 'আমি কি তোমাদেরকে (পৃথিবীতে) এতো দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে? তোমাদের কাছে তো সতর্ককারীও (নবী) এসেছিল। অতএব এখন (কৃতকর্মের) শাস্তি আস্বাদন কর; কেননা, যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। [অনুরূপ ৬:২৭,২৮, ২৩:১০৭,১০৮, ৩২:১২]

২৩:১০৯। 'আমার বান্দাগণের মধ্যে তো এমন একদল ছিল যারা বলত, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, অতএব তুমি আমাদের (দোষ-ক্রটিসমূহ) ক্ষমা কর ও দয়া কর, (কেননা) তুমিইতো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

২৩:১১০। 'কিন্তু তোমরা তাদেরকে নিয়ে এতোই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়ে ছিল, আর তোমরা তাদেরকে নিয়ে হাসি-তামাসা করতেই থাকতে।'

২৩:১১১। তাই আজ আমি তাদেরকে তাদের ধৈর্য ধারণের কারণে পুরস্কৃত করলাম; প্রকৃতপক্ষে তারাই হলো সফলকাম।'

৪০:৪৯। অগ্নিবাসীরা জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বলবে, 'তোমাদের প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা কর যেন তিনি আমাদের উপর থেকে (অন্তত) একটি দিনের শাস্তি লাঘব করেন।'

৪০:৫০। তারা বলবে, 'তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের রাসূলগণ আসেননি?' তারা উত্তর দিবে, 'অবশ্যই এসেছিল।' প্রহরীরা বলবে, 'তা হলে তোমরাই প্রার্থনা কর; আর কাফিরদের প্রার্থনা কেবল ব্যর্থতায়ই পর্যবসিত হয়।' (অর্থাৎ আল্লাহ্ কবুল করেন না)।

৪৩:৭৭। তারা চীৎকার করে বলবে, 'হে মালিক (জাহান্নামের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রহরী)! তোমার প্রতিপালক যেন আমাদেরকে (চিরতরে) নিঃশেষ করে দেন।' সে বলবে, '(তা হবার নয়), তোমরা এভাবেই (চিরকাল) থাকবে।' [অনুরূপ ২৫:১৩ ~ ২৫:১৪]

৭:৫০। (এবার) জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীগণকে সম্বোধন করে বলবে, 'আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও, অথবা আল্লাহ্ তা'আলা জীবিকাস্বরূপ তোমাদের যা দিয়েছেন তা থেকে (অন্তত) কিছু দাও।' তারা (জান্নাতবাসীরা) বলবে, 'আল্লাহ্ তো এই উভয় (জিনিস)-ই কাফিরদের জন্য (এখানে) হারাম করে দিয়েছেন,

৭:৫১। 'যারা তাদের দ্বীনকে খেল-তামাসারূপে গ্রহণ করেছিল এবং যাদেরকে পার্থিব জীবন (এর মোহ) প্রতারিত করেছিল।' সুতরাং আজ *আমরা* (আল্লাহ্ তা'আলা) তাদেরকে (সেভাবে) ভুলে থাকব যেভাবে তারা তাদের এই দিনের সাক্ষাতকে ভুলেছিল এবং যেভাবে তারা *আমাদের* নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছিল।

৭৪:৪২। (জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে), 'তোমাদেরকে কিসে এই অগ্নিকুণ্ডের ভয়াবহ শাস্তিতে নিক্ষেপ করেছে?'

৭৪:৪৩। তারা উত্তর দেবে, 'আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না,

৭৪:৪৪। 'আর অভাবগ্রস্তদের আমরা আহার্য দিতাম না,

৭৪:৪৫। 'বরং অসার আলোচনাকারীদের সাথে আমরা অসার আলোচনায় মগ্ন থাকতাম,

৭৪:৪৬। 'আর (সর্বোপরি) আমরা (এই) কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করতাম, -

৭৪:৪৭। 'যতক্ষণ না আমাদের নিকট অবধারিত (মৃত্যুর) সময়টি এসে পড়ল।'

৭৪:৪৮। তাই (আজ) সুপারিশকারীদের কোন সুপারিশও তাদের উপকারে আসবে না।

৩.৬। অনেক জাহান্নামবাসী নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, মানব জাতির এক হাজার জনের মধ্যে নয়শত নিরানব্বই জনই জাহান্নামে যাবে। (সহীহ্ মুসলিম ১.৪৩০)। এদের একটি বড় অংশ হবে ইয়াজুজ-মাজুজের দল। তবে জান্নাতবাসীদের অর্ধাংশই হবে শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা) এর উম্মাত।

জাহান্নামবাসীদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর শাফাআ'তের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। (সহীহ্ বুখারী ৮.৫৭১)। বাকিদের মধ্যে যাদের পুণ্য শূন্যের কাছাকাছি এবং কবীরা গুনাহ্সহ পাপের পাল্লা ভারী হওয়ার কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, অথচ তাদের অন্তরে ঈমান ছিল, তা যত অল্পই হোক, তারাও নির্ধারিত শাস্তি ভোগের পর আল্লাহ্র দয়ায় জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। (কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকরা চিরকাল জাহান্নামেই থাকবে)।

উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এর নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। - সহীহ্ মুসলিম-৪৩।

সর্বশেষ জান্নাতীরা

জাহান্নামের আগুনে পুড়ে যাওয়া ঈমানদার পাপীদের দেহে জান্নাতের নাহর্-আল হায়াতের পানি ঢেলে দেয়া হবে এবং তখন তারা আবার উজ্জ্বল ও সতেজ চেহারা ফিরে পাবেন। বুখারী (র) বর্ণিত অপর একটি সহীহ্ হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "এরা যখন সম্পূর্ণরূপে পাক সাফ হয়ে যাবে তখন

তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। আল্লাহ্‌র শপথ! তোমাদের প্রত্যেকেই যেমন তার এই পার্থিব ঘরের পথ চিনতে পারে তার চেয়ে বেশী তারা জান্নাতে তাদের ঘর ও স্থান চিনতে পারেবে।" (সহীহ্ বুখারী-৩.৬২০)

অপরদিকে কাফির ও মুশরিক যারা জাহান্নামের চিরকালীন বাসিন্দা হয়ে থাকবে তাদের ভালকাজ সম্পর্কে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দেন যে, তারাও ভাল কাজের বিনিময় পাবে এবং তা হবে "বড় আযাব হতে ছোট আযাব।"

চতুর্থ অধ্যায়

কুরআনে কিয়ামাত দিবসে সাফল্য লাভের স্পষ্ট দিকনির্দেশনা

৪.১। ঈমান পুণ্যকর্ম জান্নাত লাভের ও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের উপায়

পরকালে জান্নাত লাভ আর জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাওয়া উভয়ই প্রায় সমার্থক, কেননা এই দুই স্থান ছাড়া সেখানে তৃতীয় কোন গন্তব্যস্থল নেই। অন্তরে ঈমান ও বাস্তবে পুণ্যকর্মের মাধ্যমে মানুষ জান্নাত লাভের প্রস্তুতি নেবে এবং পাপকার্য হতে বিরত থেকে নিজেকে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ রাখবে। এই সাফল্য লাভের দিক নির্দেশনাই হচ্ছে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর জীবনাদর্শ এবং এর মূল ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। ঈমান ছাড়া জীবনের সকল কাজই পরকালের জন্য সম্পূর্ণ নিষ্ফল। আবার কেবল মুখে ঈমান এনেছি বললেই পার পাওয়া যাবে না, সৎকর্মের (আমল-এ-সালেহ্) মাধ্যমে প্রকৃত ঈমানের পরীক্ষায় পাসও করতে হবে। এজন্যই কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বার বার মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন : 'যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তারাই সফল হবে'। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে এও বলেছেন,

২৯:২। মানুষ কি ধারণা করে যে 'আমরা ঈমান এনেছি' - (কেবল) এই কথা বললেই তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?' (অনুরূপ আয়াত - ২:২১৪ ও ৩:১৪২)।

সৎকর্ম হচ্ছে এক আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা, এবং তাঁর ও তাঁর রাসূলের (সা) নির্দেশিত বিধিনিষেধ মেনে চলা। ইবাদাত কবুল হওয়ার শর্ত হচ্ছে ঈমান, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত এবং তাঁর রাসূল (সা) এর প্রদর্শিত নিয়মে ইবাদাত করা। ইসলামের মৌলিক তত্ত্ব সম্পর্কিত নীচের বিখ্যাত হাদীসটি হচ্ছে মানব জীবনের সৎকর্মের মৌলিক দিক নির্দেশনা :

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি বলেছেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে ছিলাম। এমন সময় একজন লোক আমাদের মধ্যে এসে হাজির হলেন। তাঁর পরিধানের কাপড় ছিল সাদা ধবধবে, মাথার চুল ছিল কালো কুচকুচে। তাঁর মধ্যে ভ্রমণের কোন চিহ্ন ছিল না। আমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে চিনেও না। তিনি নিজের দুই হাঁটু নবী করীম (সা)-এর দুই হাঁটুর সাথে লাগিয়ে বসে পড়লেন আর তাঁর দুই হাত নিজের দুই উরুর উপর রাখলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ইসলাম হলো, তুমি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযানের রোযা পালন করবে এবং বাইতুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র ঘর, কা'বা) পৌঁছার সামর্থ্য থাকলে হজ্জ পালন করবে। (আগন্তুক) বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তাঁর কথা শুনে আমরা বিস্মিত হলাম যে, তিনিই প্রশ্ন করছেন আর তিনিই তা সত্যায়িত করছেন। (আগন্তুক) তৎপর বললেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল (সা) বললেন, ঈমান হলো, আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, আর বিশ্বাস করবে তাক্‌দীরের ভাল ও মন্দের প্রতি। তিনি (আগন্তুক) বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর বললেন, আমাকে ইহ্‌সান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল (সা) বললেন, ইহ্‌সান হলো, আল্লাহ্‌র ইবাদাত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ; আর যদি তুমি তাঁকে না ও দেখ, তা হলে (ভাববে) তিনি তো তোমাকে দেখছেন। অতঃপর (ঐ ব্যক্তি) বললেন, আমাকে কিয়ামাত (এর সময়) সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল (সা) বললেন, এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তিনি জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা বেশী জানেন না। ঐ ব্যক্তি বললেন, তা হলে আমাকে (কিয়ামাত) এর আলামত সম্পর্কে বলুন। রাসূল (সা) বললেন, (তা হলো) দাসী আপন মুনিবকে প্রসব করবে; আর নগ্নপদ, বিবস্ত্রদেহ দরিদ্র মেষপালকদের বিরাট বিরাট অট্টালিকার (অধিকারী হওয়ার) প্রতিযোগিতায় গর্বিত দেখতে পাবে।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, পরে লোকটি প্রস্থান করলেন। আমি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তারপর রাসূল (সা) আমাকে বললেন, হে উমার! তুমি জান, এই প্রশ্নকারী কে? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সম্যক জ্ঞাত

আছেন। তিনি বললেন, তিনি জিব্রাঈল। তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে তিনি তোমাদের কাছে এসেছিলেন। - সহীহ্ মুসলিম-১ ও সহীহ্ বুখারী-৪৮।

এই অধ্যায়ে ইসলাম, ঈমান, আমল-এ-সালেহ (সৎকর্ম) এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত (পাপ) কর্মসমূহ সম্পর্কিত কুরআনুল কারীমের কিছু বিশিষ্ট আয়াত সংকলিত হলো।

ঈমান :

তৌহীদের বাণী, ঈমান ও ঈমানদারের পরিচয়, আল্লাহ্র একত্ব ও গুণাবলী এবং ঈমানের ভিত্তির বর্ণনা সম্বলিত কুরআনের বিশিষ্ট আয়াতসমূহ :

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ج اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ج لاَتَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلاَنَوْمٌ ط لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلاَيُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلاَّ بِمَا شَآءَ ج وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ج وَلاَيَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ.

২:২৫৫। আল্লাহ্! তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ (উপাস্য তথা ইবাদাতের দাবীদার বা যোগ্য) নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক, অনাদি ও অনন্ত সত্তা। তন্দ্রা বা ঘুম তাঁকে স্পর্শ করে না। মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সমস্তকিছুই তাঁর (একক মালিকানাধীন)। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে (কারো ব্যাপারে) সুপারিশ করবে? তাদের (সকল সৃষ্ট প্রাণীর) সম্মুখে ও পশ্চাতে (অতীতের ও ভবিষ্যতের সকল ঘটনা পরিণতি) যা কিছু আছে সে সম্পর্কে তিনি অবগত। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কোন বিষয়ই তারা আয়ত্ত্ব করতে পারবে না। তাঁর 'কুরসী' (একচ্ছত্র ক্ষমতার এক নিদর্শন, যার অবস্থান তাঁর আরশের নীচে) আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত, আর এসবের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না; এবং তিনি সবচেয়ে মহান ও অসীম মর্যাদাশীল।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ج عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ج هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ.

৫৯:২২। তিনিই আল্লাহ্, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবকিছু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

৫৯:২৩। তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই, তিনিই (সৃষ্টির একক) অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই সকল শান্তির উৎস, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই মহামহিমান্বিত। তারা (মুশরিকরা) যাদেরকে (তাঁর) শরীক স্থির করে, তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র ও মহান।

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ط يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

৫৯:২৪। তিনিই আল্লাহ্ (যিনি একমাত্র) সৃষ্টি কর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, গঠন ও রূপ দাতা, সকল সুন্দরতম নাম তাঁরই (জন্য প্রযোজ্য ও নির্ধারিত)। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ج اَللّٰهُ الصَّمَدُ ج لَمْ يَلِدْ لا وَلَمْ يُوْلَدْ لا وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

১১২:১ - ১১২:৪। (হে মুহাম্মদ!) বলুন, তিনিই আল্লাহ্, তিনি এক-অদ্বিতীয়; তিনি (একমাত্র সত্তা, যিনি) কারোই মুখাপেক্ষী নন (আর সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী); তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং কারো থেকেও তিনি জন্মগ্রহণ করেননি; আর তাঁর সমতুল্যও আর কেউই নেই।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ.

৫৫:২৬। ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে তা সবই বিলীন হয়ে যাবে,

وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوا الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ.

৫৫:২৭। অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময় ও মহানুভব।

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ج فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ.

২১:২২। যদি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলে আল্লাহ্ ব্যতীত আরো বহু ইলাহ্ (মা'বুদ) থাকত, তা' হলে উভয়ই অরাজকতা (ও ধ্বংসে) পতিত হতো; অতএব এরা (মুশরিকরা) যা কিছু (আল্লাহ্‌র প্রতি) আরোপ করে তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ও মহান।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ قف لاَنُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ قف وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ز غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

২:২৮৫। আল্লাহ্‌র রাসূল সে-সকল বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে যা তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সকল বিশ্বাসীগণও (সে-সবের প্রতি ঈমান এনেছে)। তারা প্রত্যেকেই আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর প্রেরিত রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। (তারা বলে) আমরা তাঁর রাসূলগণের একে অন্যের মধ্যে কোন তারতম্য করি না, আর তারা বলে, আমরা (তাঁর বাণী) শুনেছি এবং তা পালন করি; (এবং প্রার্থনা করে) হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাই, আর (সকলের) প্রত্যাবর্তন তো হবে তোমারই নিকট।

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ص لاَنُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ز وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ.

৩:৮৪। (হে রাসূল!) বলুন, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আমাদের উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কুব ও তাদের বংশধরদের উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং যা কিছু (বাণী) মূসা, ঈসা ও (অন্যান্য) নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রদান করা

হয়েছিল, তাতে ঈমান এনেছি; আমরা তাদের (নবীগণের) একে অন্যের মধ্যে কোন প্রকার তারতম্য করি না; আর আমরা সকলে তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী (মুসলমান)।

মানুষের অবশ্যই উচিত যে প্রত্যেকে যেন ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ থেকে আত্মরক্ষা করে অর্থাৎ যে সকল নিষিদ্ধ কাজ করলে ঈমান নষ্ট হয় অথবা যে সকল করণীয় কাজ না করলে ঈমান নষ্ট হয় তা পরিহার করে চলা। এও মনে রাখা দরকার যে, যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, নিষিদ্ধ কোন কাজ করা যায় কিংবা ফর্য কোন কাজ না করলেও চলে, তাতেও ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে।

এও মনে রাখা দরকার যে, ঈমানের মৌলিক শাখাসমূহের সাথে যে সকল বিষয় বা প্রশাখাসমূহ সম্পৃক্ত সেগুলিতেও সমানভাবে বিশ্বাস রাখাও ঈমানের অঙ্গ, অর্থাৎ বিশ্বাস না রাখলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে। যেমন, কিয়ামাত দিবসের উপর ঈমান আনার মত কিয়ামাতের সাথে সম্পৃক্ত শাফা'আত, হাউয-এ-কাউসার, আমলনামা, পুলসিরাত, দাড়িপাল্লা, বিচার, জাহান্নাম ও জান্নাত ইত্যাদি সকল বিষয় যা কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তাতে সন্দেহমুক্তভাবে বিশ্বাস রাখতে হবে।

ইসলাম :

ইসলামই আল্লাহ্র একমাত্র মনোনীত ধর্ম এবং রাসূল (সা)-এর আনুগত্যই সাফল্যের পথ। ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন :

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ.

৩:১৯। নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহ্র নিকট একমাত্র (মনোনীত) ধর্ম।

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

৩:৩১। বল (হে মুহাম্মাদ!), 'যদি তোমরা (যথার্থই) আল্লাহ্কে ভালবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর, (তা' হলে) আল্লাহ্ তোমাদিগকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ তো অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ج فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ.

৩:৩২। বল, 'তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত হও। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে (জেনে রাখো) আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না।

مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ج وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

৩:৮৫। এবং যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে তা কখনো তার নিকট হতে গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ج وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا.

৪:৮০। যে রাসূলের অনুগত্য করল সে তো আল্লাহ্রই অনুগত্য করল; কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে (হে মুহাম্মাদ!), তাদের উপর তোমাকে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে প্রেরণ করি নি।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

৫:৩। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম।

ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। ঈমান ছাড়া ইসলাম নেই, তদ্রূপ ইসলাম ছাড়াও ঈমান নেই। অর্থাৎ ইসলাম তথা ইসলাম-নির্দেশিত আমল ছাড়া ঈমান মূল্যহীন এবং ঈমান ছাড়া আমল অর্থহীন।

আমল করার জন্য জ্ঞান দরকার, তাই ঈমান এর সাথে জ্ঞানার্জন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অনুরূপভাবে আমলের সাথে ইখলাস বা মনের একনিষ্টতা প্রয়োজন। আর আমল হতে হবে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী এবং কেবল মাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য।

আমল-এ-সালেহ (পুণ্যকর্ম) : প্রকৃত ঈমানদার এবং পুণ্যবানদের পরিচয়

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ.

৪৯:১৫। (প্রকৃত) মু'মিন তারাই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, পরে কখনো সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে; - এরাই হচ্ছে সত্যনিষ্ঠ।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

৮:২। মু'মিন তো তারাই, যাদের হৃদয়, আল্লাহ্কে উল্লেখ করা হলেই কেঁপে উঠে, এবং যখন তাদের নিকট তাঁর (কুরআনের) আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমানকে বর্ধিত (ও শক্তিশালী) করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই (সকল ব্যাপারে) নির্ভর করে থাকে।

اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

৮:৩। (এবং) যারা সালাত কায়েম করে এবং *আমরা* যা রিযক তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে (সৎ পথে) ব্যয় করে।

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ لا وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ج وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ج وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ج وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

২:১৭৭। পূর্ব কিংবা পশ্চিম (কোন বিশেষ) দিকে (নামাযে) তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নিহিত নেই; বরং পুণ্য আছে (তার), যে আল্লাহ্ তা'আলা, পরকাল, ফিরিশতাগণ, (আল্লাহ্র নাযিলকৃত) কিতাবসমূহ ও নবীগণের প্রতি ঈমান আনে এবং (কেবল) আল্লাহ্র ভালবাসায় (উদ্বুদ্ধ হয়ে) আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, (বিপদগ্রস্ত) পর্যটক, (দরিদ্র) সাহায্য প্রার্থীকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ (বা সম্পদ) ব্যয় করে; এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করে, আর অভাবে, দুঃখ-ক্লেশে ও

সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করে। এরাই হচ্ছে সত্যপরায়ণ এবং এরাই হচ্ছে তারা যারা মুত্তাকী (প্রকৃত আল্লাহ্‌ভীরু)। (দ্রঃ - কিবলা পরিবর্তন প্রসঙ্গে নাযিলকৃত আয়াত)।

اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ

بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

৯:১১২। যারা (অনুতপ্ত হৃদয়ে) আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন (তওবা) করে, যারা তাঁরই ঈবাদত করে, তাঁর প্রশংসা করে, সিয়াম (রোযা) পালন করে, রুকু ও সিজদা (সালাত আদায়) করে, সৎকার্যের নির্দেশ দান করে, অসৎ কাজে নিষেধ করে এবং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণ করে (অতিক্রম করে না), - এসব মু'মিনদেরকে (আল্লাহ্‌র তরফ থেকে পুরস্কারের) সুসংবাদ দাও।

وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ

صَالِحًا ز فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِى الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ.

৩৪:৩৭। তোমাদের ধন-সম্পদ কিংবা তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদিগকে (মর্যাদায়) আমাদের নিকটবর্তী করে দেবে তা নয়, বরং যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে কেবল তাদের জন্যই তাদের কর্মের ফলস্বরূপ আছে বহুগুন পুরস্কার, আর তারা (জান্নাতের) সুরম্য প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।

(ঈমানের উপর অতিরিক্ত পাঠ্য আয়াতসমূহ : ২:২৫, ৩:১৮, ৪:১২২ - ১২৪, ৪:১৩৬, ৫৯, ৬:১৮, ৯:৭১ - ৭২, ১০:১০৪, ১৩:২০-২৪, ১৮:৩০ - ৩১, ২১:৯৪, ২৩:১ - ১১, ২৩:৫৭ - ৬১, ২৪:৫৫, ২৫:৬১ - ৭৭, ২৯:৭, ৩৩:৩৫, ৪১:৩০ - ৩৩, ৭০:১৯ - ৩৫, ৭৬:৭ - ১০, ১০৩:১ - ৩ ইত্যাদি)।

কুরআনের ও হাদীসের বর্ণনায়

কোন কর্ম পুণ্যকর্ম হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য কয়েকটি মৌলিক শর্ত আছে, যার প্রধান হচ্ছে ঈমান। ঈমান ছাড়া কোন 'ভাল' কাজই, তা যত ভালভাবে এবং সৎ উদ্দেশ্যে করা হোক না কেন, পুণ্যকর্ম হিসেবে আমলনামায় স্থান পাবে না অর্থাৎ সওয়াব বা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পুরস্কার/প্রতিদান পাওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হবে

না। অন্যান্য মৌলিক শর্ত হচ্ছে বিশুদ্ধ নিয়ত, তথা একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মনে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজটি করা, একমাত্র আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল (সা) এর নির্দেশিত কাজ করা এবং একমাত্র তাঁদের নির্দেশিত পন্থায় করা। এর অর্থ হচ্ছে লোক দেখানোর বা অন্য কোন নিয়তে কোন কাজ করলে, বা আল্লাহ্‌র আদেশকৃত নয় ও রাসূল (সা) এর অনুসরণীয় নয় এমন মনগড়া কাজকে অথবা কোন পাপ কাজকে ভাল কাজ মনে করে তা করলে, কিংবা আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল যেভাবে একটি ইবাদাত করতে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেভাবে তা না করে নিজের ইচ্ছামত নিয়মে করলে কোন ইবাদাত পুণ্য বয়ে নিয়ে আসবে না, তা পাপ (বিদ'আত) হিসেবেই গণ্য হবে।

পুণ্য কর্মের তালিকায় সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদাত হচ্ছে পর্যায়ক্রমে ফর্‌য সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হজ্জ। যাকাত নিসাব পরিমাণ মালের মালিকের উপর (অন্যান্য শর্ত সাপেক্ষে) এবং হজ্জ ভ্রমণের খরচ যোগান দেয়ার সামর্থ্যবানদের জন্য প্রযোজ্য। ঈমানসহ এই পাঁচটি ফরয্‌ হচ্ছে ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ। সকল সৎ আমলের জন্য জ্ঞানার্জন করাও ফরয্‌ এবং পুণ্য কর্ম।

এই চারটি মূল ফর্‌য ইবাদাত অতিরিক্ত পরিমাণে তথা নফল হিসেবে বেশী করে আদায় করলেও আল্লাহ্‌ তা'আলা অসীম সওয়াব দান করেন। পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী জিহাদ ও হিজরত করাও মানুষের জন্য ফর্‌য হয়ে যায়। তদ্রূপ স্বাভাবিক ভাবে নফল এমন অনেক পুণ্যের কাজ পরিস্থিতি অনুযায়ী ফর্‌য বা ওয়াজিবে পরিগণিত হয় (যেমন খাদ্যাভাবে কারো জীবন সংকটাপন্ন হয়ে পড়লে তাঁকে খাদ্য দিয়ে বাঁচানো)।

কয়েকটি বিশেষ পুণ্যের কাজ আছে যা উঠতে বসতে যে কোন সময় (অর্থাৎ যেগুলি কোন আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি বা সময়-নির্ভর নয়) করা যায় তা হচ্ছে বিভিন্নভাবে আল্লাহ্‌র গুণকীর্তন করত তাঁকে স্মরণ তথা যিকির করা। সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির হচ্ছে তাওহীদের ঘোষণা তথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই)। অনুরূপ মর্যাদার অন্যান্য যিকির হচ্ছে তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ - আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা), তাহমিদ (আলহামদুলিল্লাহ - সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র), তাকবীর (আল্লাহু আকবার - আল্লাহ্‌ সর্বাপেক্ষা মহান), তাওবা (ইসতেগফার - আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসা ও তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া), তাকওয়া (আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং তাঁর শাস্তির কথা স্মরণ করত পাপ থেকে দূরে থাকা),

সবর (আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থেকে ধৈর্য ধারণ করা এবং ধৈর্যের সাথে সাথে সংগ্রাম করে যাওয়া), তাওয়াক্কুল (সকল অবস্থায় আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা) কুরআন তিলাওয়াত করা, বুঝা ও তদনুযায়ী আমল করা, আল্লাহ্‌র কাছে (নিজের ও সকল ঈমানদারদের জন্য) বিনীতভাবে দু'আ করা এবং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া ইত্যাদি।

হাদীসে আছে, সামুরা বিন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, শ্রেষ্ঠ কালাম হচ্ছে চারটি, - সুবহানাল্লাহি, ওয়াল হামদু লিল্লাহি, ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার। অপর বর্ণনায় আছে এই চারটি কালাম আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয়, এর যেটি প্রথমে বল ক্ষতি নেই। অপর হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, এই চার কালাম বলা সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষাও আমার কাছে প্রিয়তর। স. মুসলিম -৫৩২৯।

বাস্তব জীবনে অনেক কাজ আছে যা খুব গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত বা পুণ্যের কাজ মনে না হলেও প্রকৃত পক্ষে সেসব কাজ খুবই পুণ্যের কাজ। তন্মধ্যে আছে মাতাপিতার বাধ্য থাকা ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, হালাল বা সদোপার্জন ও তা দ্বারা পোষ্যদের ভরণপোষণ, সত্যবাদিতা, ন্যায় বিচার, সৎকর্মে উপদেশ ও মন্দকাজে নিষেধ দেয়া, সৎকর্মে অবিচল প্রচেষ্টা, দ্বীনীকাজে মানুষকে উৎসাহ দেয়া, গরীব ও অভাবগ্রস্তদের দান খয়রাত করা, ছোট শিরক্ ও সকল প্রকার বিদ'আত থেকে আত্মরক্ষা করা, মুসলমানদের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদ মিটানো, তাদের দোষত্রুটি গোপন রাখা, মুসলমানদেরকে সালাম দেয়া ও সালামের উত্তর দেয়া, দুর্বল ও নিঃস্বদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, নিকটাত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, মানুষের কোন প্রকার (ধন, সম্মান ইত্যাদি) ক্ষতি করা থেকে দূরে থাকা, রোগীকে দেখতে যাওয়া ও পরিচর্যা করা, অজ্ঞদেরকে (দ্বীনী ও বৈধ পেশার) জ্ঞানের আলো দেয়া, প্রতিবেশীর প্রতি ভাল সম্পর্ক বজায় রাখা ও তাদের হক আদায় করা, মানুষকে ক্ষমা করা এবং নিজের আচার-আচরণ তথা চলা-ফেরা, দেখা-সাক্ষাৎ, আহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের শিষ্টাচার ইসলামের বিধান (তথা রাসূল সা.-এর সুন্নত) অনুযায়ী মেনে চলার অভ্যাস বজায় রাখা ইত্যাদি। কোন পুণ্যকাজকেই তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়, কেননা একটি মাত্র পুণ্যের ঘাটতির জন্য (অথবা একটি মাত্র পাপের আধিক্যের কারণে) মানুষের ভাগ্যে জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে যেতে পারে।

সর্বপ্রথম জান্নাতীরা

হাদীসে আছে, আমর ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করেন, "আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম কে জান্নাতে যাবে তা তোমরা জান কি?" সাহাবীগণ উত্তরে বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা) ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে দরিদ্র মুহাজিরগণ, যারা দুনিয়ার ভোগবিলাস হতে দূরে ছিল, কষ্ট ও বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতো। যাদের মনের বাসনা মনেই রয়ে গিয়েছিল এমতাবস্থায় তারা মৃত্যুবরণ করে ছিল। রহমতের ফিরিশতাগণকে আল্লাহ্ বলবেন, যাও এদের মোবারকবাদ দাও। ...এরা হচ্ছে আমার সেই বান্দা যারা শুধু আমারই ইবাদাত করত, আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে নাই, পার্থিব সুখ-সম্ভোগ হতে বঞ্চিত ছিল এবং কষ্ট ও বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করেছিল। তাদের কোন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি। এতদ্‌সত্ত্বেও তারা ধৈর্য ধারণ করেছে ও কৃতজ্ঞ থেকেছে।" (মুসলিম - ৬৫৯৬ ও মুসনাদে আহমদ সংক্ষিপ্তাকারে)।

৪.২। কুরআনে বর্ণিত সবচাইতে বড় পাপীদের পরিচয় : কাফির, মুনাফিক ও মুশরিক

(১)। **কাফির বা অবিশ্বাসী** : আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বকে যারা অস্বীকার বা অবিশ্বাস করে তারা কাফির বা অবিশ্বাসী হিসেবে আখ্যায়িত। এদের ধারণায় প্রাকৃতিকভাবে আপন নিয়মে বিশ্বের সব কিছু ঘটছে এবং বর্তমান বাস্তব জগত বা ইহকাল ছাড়া আর কোন জগতের অস্তিত্ব নেই। ঈমানের মূল স্তম্ভ তথা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্বে অবিশ্বাস করা ছাড়াও ঈমানের অন্যান্য মৌলিক স্তম্ভের যে কোন একটিতে কেউ অবিশ্বাস করলে (যেমন ফিরিশতার অস্তিত্ব, আসমানী কিতাব, নবুয়ত, পরকাল, তাকদীর, আল্লাহ্‌র একক গুণাবলী ইত্যাদি সত্য হওয়ার ব্যাপারে), সে কাফির হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

৪:১৫০। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণকে অস্বীকার করে এবং যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে (বিশ্বাসের ব্যাপারে) ভেদাভেদ করে এবং বলে, 'আমরা

(রাসূলদের) কয়েকজনকে বিশ্বাস করি এবং কয়েকজনকে অবিশ্বাস করি', আর এর মধ্যবর্তী কোন পথ তারা অবলম্বন করতে চায়,-

৪:১৫১। এরা (সকল)-ই হচ্ছে প্রকৃত কাফির; এবং কাফিরদের জন্য *আমরা* প্রস্তুত রেখেছি ভীষণ লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

৪:১৬৮। যারা কুফরী করেছে ও যুলুম (সত্য গোপন) করেছে তাদেরকে আল্লাহ্ কখনো ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন না, -

৪:১৬৯। কেবল জাহান্নামের পথ ব্যতীত; সেখানেই তারা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে এবং একাজ আল্লাহ্র পক্ষে অতি সহজ। [অনুরূপ ১৬:১০৪]

৮:৫৫। বস্তুতঃ আল্লাহ্র নিকট নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে তারাই, যারা কুফরী করে এবং ঈমান আনে না।

৪৭:৩৪। যারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করে এবং (মানুষের জন্য) আল্লাহ্র রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাদেরকে আল্লাহ্ কিছুতেই ক্ষমা করবেন না।

৩:৯১। যারা অবিশ্বাস করে এবং অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে তাদের কারো কাছ থেকে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণও গ্রহণ করা হবে না যদিও তা তারা (শাস্তির) মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চায়। এরাই হচ্ছে তারা যাদের জন্য নির্ধারিত আছে কঠোর শাস্তি; আর তাদের কোন সাহায্যকারীও থাকবে না।

(অতিরিক্ত পাঠ্য : ২:৬-৭, ২:১৭০-১৭১, ৩:১০ ৩:৯০, ৫:৩৬-৩৭, ৬:২১, ৭:৪০, ৮:৩১, ৮:৩৬-৮:৩৭, ৮:৫০-৫১, ২৯:১২-১৩, ১৮:১০৩-১০৬, ৩৯:৭ ইত্যাদি।

(২)। **মুনাফিক** : মুনাফিকরা মূলত কাফির, কিন্তু বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করে অথবা মুসলমান পরিচয়ে মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকে। একদিকে এরা সুযোগ পেলেই মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং মুসলিম সমাজের চরম ক্ষতি সাধনে লিপ্ত হয়, অপরদিকে নানা অপকর্মের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের জন্য দুর্নাম সৃষ্টি ও বিভক্তি রচনা করে। আল্লাহ্র কাছে বিভিন্ন শ্রেণীর কাফিরদের মধ্যে এরা জঘন্যতম, কেননা সাধারণ কাফিররা সমাজে চিহ্নিত ও পরিচিত থাকে এবং তাদের ব্যাপারে বিশ্বাসীগণ সতর্ক থাকতে পারে। মুনাফিকরা মুসলমাদের সাথে মিলে মিশে থাকে বলে তাদেরকে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া সঠিকভাবে কেউ

চিনতে পারে না এবং তাদের মিথ্যাচারিতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় মুসলমানরা সর্বদা বিপদের সম্মুখীন হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

২:৮। মানুষের মধ্যে এমন লোকও (মুনাফিক) আছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্র উপর এবং আখিরাত দিবসের উপর ঈমান এনেছি', কিন্তু তারা মু'মিন নয়।

২:৯। তারা আল্লাহ্ ও মু'মিনগণের সাথে প্রতারণা করতে চায় অথচ তারা কেবল নিজেদেরই প্রতারিত করে, আর তা তারা বুঝতে পারে না।

২:১৪। যখন তারা ঈমানদারগণের সাথে মিশে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি', আর যখন তারা তাদের (দলের) শয়তানদের (বিপথগামীদের) সাথে নিভৃতে মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি, আমরা তো শুধু (তাদের সাথে) ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি।'

[২:৮ থেকে ২:১৬ পর্যন্ত আয়াত দ্রঃ]

৪:১৩৮। মুনাফিকদেরকে এই সুসংবাদ (মূলত দুঃসংবাদ) দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৪:১৩৯। এরাই তারা, যারা মু'মিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে। এরা কি তাদের কাছে সম্মান চায়? সমস্ত সম্মানের উৎস তো কেবল আল্লাহ্!

৪:১৪৫। নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে, তাদের জন্য তুমি কোনই সাহায্যকারী পাবে না।

[আরো দেখুন ৪:১৩৮ থেকে ৪:১৪৬ পর্যন্ত এবং ৯:৬৭ - ৯:৬৮ আয়াত]

৬৩:১। (হে রাসূল!) যখন মুনাফিকরা আপনার নিকট আসে তারা বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি নিশ্চই আল্লাহ্র রাসূল।' আল্লাহ্ও জানেন যে আপনি নিশ্চয় তাঁর রাসূল, এবং আল্লাহ্ (এও) সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

৬৩:৬। তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর, উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ্ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না; আল্লাহ্ ফাসিকদেরকে (সীমালঙ্ঘনকারী পাপী) সৎপথে পরিচালিত করেন না।

(আরো দেখুন ৬৩:২- ৫, ৬৩:৭- ৮)

(৩)। **মুশরিক** : যারা আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার খাড়া করে এবং সেই অংশীদারদের (দেব-দেবী, মূর্তি, প্রাকৃতিক শক্তি বা বস্তুসমূহ) উপাসনা করে তাদেরকে মুশরিক বলা হয়। বাহ্যতঃ এরা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে স্বীকার করে, কিন্তু কল্পিত দেব-দেবী ও শক্তিকে আল্লাহ্‌র শরিক বা সমতুল্য অথবা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র একত্ব ও নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ও আধিপত্যকে অস্বীকার করে। এরাও আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে জঘন্যতম পাপী, যাদের ক্ষমা নেই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

৩৯:৩। জেনে রেখো, অবিমিশ্র আনুগত্য (দ্বীন) কেবল আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। কিন্তু যারা তাঁর পরিবর্তে অন্য কিছুকে অভিভাবক (ও রক্ষক)-রূপে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা তো এদের পূজা এজন্যই করি যে, এরা আমাদের আল্লাহ্‌র নিকটতর করে দেয়।' নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই তাদের মধ্যে ঐসব বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন যেগুলোতে তারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ পোষণ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তিকে সৎপথ প্রদর্শন করেন না, যে মিথ্যাবাদী ও অবিশ্বাসী।

৩৯:৪৫। আর যখন এক (ও অদ্বিতীয়) আল্লাহ্‌র কথা উল্লেখ করা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর বিরক্তিতে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, কিন্তু যখন তাঁকে ছাড়া অন্যান্য (উপাস্য)-দের কথা উল্লেখ করা হয় তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে।

৪৩:২০। এবং তারা (এও) বলে, 'দয়াময় আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমরা এদের (অন্যান্য উপাস্যদের) পূজা করতাম না।' এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু (মিথ্যা) অনুমান-নির্ভর কথা বলে।

৪:১১৬। আল্লাহ্ তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করাকে অবশ্যই ক্ষমা করবেন না, এ ছাড়া অন্যান্য সব (ক্ষুদ্রতর পাপ) তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন। আর যে লোক আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার যোগ করে সে তো চরমভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল। (অতিরিক্ত পাঠ্য - ১৬:৩৫, ১৭:৫৩, ১৭:৫৭, ৩০:৪২ ইত্যাদি)

কুরআনের বর্ণনায় সবচাইতে বড় ও জঘন্যতম পাপসমূহ

সবচাইতে জঘন্যতম পাপ : যে-সকল কাজকে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছেন এবং যা সবচাইতে জঘন্য পাপের অন্তর্ভুক্ত, সে সকল বিষয়কে

আল্লাহ্ নীচের দুটি আয়াতে সংক্ষেপে বর্ণনা করে দিয়েছেন যাতে মানুষ তা থেকে অবশ্যই দূরে থাকে।

৬:১৫১। বলে দিন (হে রাসূল), তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে সকল বিষয় নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন তা আবৃত্তি করে শুনাই। তা হচ্ছে, 'তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্রের ভয়ে (ও অজুহাতে) তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, (কেননা) *আমরাই* (একমাত্র প্রতিপালক আল্লাহ্) তোমাদেরকে এবং তাদেরকে রিয্‌ক দিয়ে থাকি। আর প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে হোক, কোন অশ্লীল কাজের নিকটেও যাবে না এবং যে প্রাণকে আল্লাহ্ পবিত্র (ও মর্যাদাবান করে তৈরী) করেছেন তাকে কখনো না-হকভাবে (যথার্থ কারণ ও বিচার ব্যতীত) হত্যা করবে না। তোমাদেরকে তিনি এই নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা অনুধাবন কর।'

৬:১৫২। তোমরা ইয়াতিমের সম্পত্তির কাছেও যাবে না, যদি না তা তার বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তার (সম্পত্তির) উন্নতির (ও রক্ষণাবেক্ষণের) উদ্দেশ্যে হয়; পরিমাপ ও ওজন সঠিকভাবে দেবে, *আমরা* কারো উপর তার সাধ্যাতীত (দায়িত্ব) ভার অর্পণ করি না; আর যখন (কোন বিচার-মীমাংসায়) কথা বলবে তখন ন্যায্য কথা বলবে, যদিও তা নিকটাত্মীয়দের সম্পর্কে হয়; এবং আল্লাহ্‌কে দেয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। এসকল নির্দেশ তিনি তোমাদেরকে দিলেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর (ও স্মরণ রাখ)।

এই দুই আয়াতের বিষয়াদি আরো বিস্তারিতভাবে আয়াত নং ৭:৩৩ ও ১৭:৩১ থেকে ১৭:৩৫ পর্যন্ত আয়াতসমূহে (ব্যাখ্যাস্বরূপ) বর্ণিত হয়েছে।

মানব জাতির জন্য সবচাইতে বড় পাপ হচ্ছে কুফর (আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে অথবা ঈমানের কোন মূল শাখাকে অস্বীকার করা) এবং শিরক্ (আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক বা অংশীদার করা)। লক্ষণীয় যে, ৬:১৫১ নং আয়াতে শিরক্ এর পরই স্থান পেয়েছে পিতামাতার প্রতি অসদ্ব্যবহারের পাপ। পিতামাতা মূল প্রতিপালকের প্রতিনিধি হিসেবে অতি কষ্টে ও ধৈর্যের সাথে সন্তানের প্রতিপালন করে থাকেন বলে তাদের মর্যাদা মানুষের কাছে এত উচ্চে, অথচ মানুষ হয় পিতামাতার এই মর্যাদার কথা জানে না অথবা স্বার্থপর হয়ে বৃদ্ধ পিতামাতাকে অবহেলা করে কিংবা তাদেরকে বাড়তি দায় ভেবে তাদের প্রতি অসহনশীল আচরণ করে।

কুফ্‌র ও শির্‌ক ছাড়াও কুরআনে আরো যে সকল কবীরা গুনাহ্‌র সরাসরি উল্লেখ অথবা ইঙ্গিত আছে যেগুলির কারণে মানুষ ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় তার মধ্যে আছে :

ক. নিজের এবং আল্লাহ্‌র মাঝখানে কোন মধ্যস্থতাকারী স্থির করা, তাদের কাছে দু'আ করা, তাদের উপর ভরসা করা এবং তাদেরকে নিজের জন্য শাফা'আত করতে বলা,

খ. আল্লাহ্‌, তাঁর নবীগণ বা ফিরিশতাগণের নামে অপমানজনক কিছু বলা বা তাদেরকে অভিসম্পাত দেয়া,

গ. রাসূলুল্লাহর (সা) আনীত হিদায়াতের চাইতে অন্য কারো হিদায়াত অধিকতর উত্তম মনে করা, কিংবা কোন মুসলিম শাসক কর্তৃক শরী'আর আইনের বদলে অন্য কোন আইন দ্বারা শাসন করা,

ঘ. রাসূল (সা) কর্তৃক আনীত শরী'আর যে কোন নির্দেশকে ঘৃণা করা, মিথ্যা প্রতিপন্ন বা অস্বীকার করা কিংবা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা,

ঙ. আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল (সা) যে সকল বিষয়কে হারাম করেছেন (যেমন হত্যা, ব্যভিচার, সুদ, মদ ইত্যাদি) এর কোনটিকে হালাল মনে করা বা ঘোষণা করা, কিংবা কোন হালাল বিষয়কে হারাম মনে করা বা ঘোষণা করা.

চ. মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সমর্থন বা সাহায্য করা ইত্যাদি।

কুরআনে ঘোষিত অন্যান্য কবীরা গুনাহ্‌সমূহের সংক্ষিপ্ত তালিকা :

উপরের উদ্ধৃত আয়াতদ্বয় এবং ৭:৩৩, ১৭:৩১ - ১৭:৩৫ আয়াতে যেসব কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে অর্থাৎ যে সব কাজ কবীরা গুনাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত তার বর্ণনা আরো বহু আয়াতেও আছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১। আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুর শরীক করা (শিরক) ও আল্লাহ্‌কে অবিশ্বাস করা (উপরে একাধিক আয়াত দ্রঃ)

২। মাতাপিতার সাথে দুর্ব্যবহার করা (১৭:২৩ - ২৪)

৩। দারিদ্র্যের ভয় বা যে কোন অজুহাতে শিশু সন্তান হত্যা করা (গর্ভপাতসহ)

৪। ব্যভিচার ও তৎসম্পর্কিত সকল অশ্লীল কাজ (২৪:২, ২৪:৩, ৪:১৫ - ১৬)

৫। মানুষ হত্যা করা (সুষ্ঠু বিচার প্রক্রিয়া ছাড়া) (২:১৭৮)

৬। ইয়াতিমের সম্পদ কুক্ষিগত করা (৪:২, ৪:১০)

৭। পরিমাপ ও ওজনে কম দেয়া (১৭:৩৫, ৫৫:৯, ৮৩:১ - ৫)

৮। মিথ্যা সাক্ষী দেয়া বা ন্যায় বিচার না করা (৪:৫৮, ৪:১৩৫, ৫:৮, ৭:২৯, ১৬:৯০)

৯। আল্লাহ্র সাথে করা অঙ্গীকার পূর্ণ না করা

এছাড়াও কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় অন্যান্য যে সকল বিষয়কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার মধ্যে আছে :

সুদ - ২:২৭৫ - ২:২৮১, ৩:১৩০, ৩০:৩৯

মদ ও জুয়া - ২:১১৯, ৫:৯০

চুরি - ৫:৩৮

অহংকার করা - ১৭:৩৭

পরনিন্দা - ২৪:১৯, ৪৯:১২, ৬৮:১০ - ১১, ১০৪:১

হারাম দ্রব্য আহার - ২:১৭৩, ৫:৩, ১৬:১১৫

সতী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ - ২৪:২৩ - ২৪:৪

অবৈধ উপার্জন বা অন্যের সম্পদ কুক্ষিগত করা - ২:১৮৮, ৪:২৯ ইত্যাদি।

হাদীসেও অনেক কাজকে কবীরা গুনাহ্ বলা হয়েছে যেমন আত্মহত্যা, জিহাদের মাঠ থেকে পলায়ন, যাদুবিদ্যা চর্চা, মসজিদুল হারামে গুনাহ্র কাজে লিপ্ত হওয়া, মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) কবীরা গুনাহ্র সংখ্যা ৭ থেকে ৭০ টি বলে উল্লেখ করেছেন, কোন কোন সাহাবী কবীরা গুনাহ্র সংখ্যা ৭০০ পর্যন্তও বলেছেন। মূলত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যে সকল কাজ করাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন এবং যে সকল কাজের জন্য আল্লাহ্র ক্রোধ বা ইহকালে অথবা পরকালে নিশ্চিত শাস্তির কথা উল্লেখ আছে, সেসব কাজই কবীরা গুনাহ্র অন্তর্ভুক্ত।

ফর্‌য কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে পরিহার করাও কবীরা গুনাহ্‌র অন্তর্গত :

আল্লাহ্‌ মুসলমানদের জন্য যে সকল কাজকে ফর্‌য বা অবশ্যকরণীয় করে দিয়েছেন সে কাজগুলি ক্রমাগত ও ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করাও কবীরা গুনাহ্‌র অন্তর্গত, কেননা তা হবে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার শামিল। তাই কোন ওজর না থাকা অবস্থায় যদি কেউ নামায না পড়ে, রোযা না রাখে, কিংবা যাকাত ফর্‌য হলে যাকাত আদায় না করে, অথবা হজ্জ্ব ফরয হলে হজ্জ্ব পালন না করে তাহলে তার এ অবাধ্যতা কবীরা গুনাহ্‌ হিসেবেই বিবেচিত হবে।

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন, মু'মিন বান্দা ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য (হচ্ছে) নামায (পরিত্যাগ করা)। (সহীহ্‌ মুসলিম-১৪৯, ১৫০)

হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য কবীরা গুনাহ্‌

ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে (৪:৩১ আয়াতের ব্যাখ্যায়) বিভিন্ন হাদীসের উদ্ধৃতিসহ আরো যেসব কর্মকে কবীরা গুনাহ্‌ বলে উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে আছে : মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, মিথ্যা শপথ করা, ধোঁকা দেয়া, পিতামাতাকে গালি দেয়া বা অভিশাপ দেয়া, আল্লাহ্‌র নিয়ামাত বা করুণা থেকে নিরাশ হওয়া ও তাঁর শাস্তি হতে নির্ভয় থাকা, মুনাফার লোভে মানুষ ও পশুর খাদ্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত আটকিয়ে রাখা, অন্যের সম্পদ জবর দখল করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ত্যাগ করা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি করা, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ না করা, কুরআনুল কারীম শিক্ষা করে ভুলে যাওয়া ইত্যাদি।

এছাড়াও কোন প্রাণীকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা, বিনা ওযরে স্ত্রী তার স্বামীর নিকট না যাওয়া, অসিয়তের ব্যাপারে (উত্তরাধিকারীদের) কারো ক্ষতি করা, বিনা ওযরে নামাযের সময় হওয়ার পূর্বে নামায পড়ে নেয়া, রাসূল (সা) এর উপর মিথ্যা আরোপ করা, তাঁর সাহাবীগণকে গালি দেয়া, বিনা কারণে সাক্ষ্য গোপন করা, মানুষকে গালি দেয়া, চোগলখুরী করা, অন্যের গোপন বিষয় জানার চেষ্টা করা, ওয়াদা ভঙ্গ করা, হিংসা করা, মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, গর্ব করা, রিয়া করা তথা প্রদর্শনীমূলকভাবে কোন ইবাদাত করা, মুহরিম নয় এমন স্ত্রী লোকের সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করা, জীবজন্তুর মূর্তি বানানো, ছবি আঁকা, উল্কি করা বা করানো, ভাগ্যগণনা করা, ভাগ্যগণনাকারী বা জ্যোতিষীর কাছে যাওয়া,

আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন কিছুর নামে শপথ করা এবং মৃত ব্যক্তির কবরে (মাজারে) কিছু চাওয়া ইত্যাদিও কবিরা গুনাহ্র অন্তর্গত। (আরো বিস্তারিত হাদীস : ইমাম নববীর রিয়াদুস্ সালেহীন ৪র্থ খণ্ড হাদীস নং ১৫১১ ~ ১৮০৭ পর্যন্ত)।

হাদীসে আছে, আবু যার্ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'হে আমার বান্দাগণ! আমি নিজের উপর অত্যাচার হারাম করেছি এবং তোমাদের উপরও তা হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা একে অপরের উপর অত্যাচার করো না। হে আমার বান্দারা! আমি তো শুধু তোমাদের কৃত আমলগুলোকে পরিবেষ্টন করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি কল্যাণ প্রাপ্ত হবে সে যেন আল্লাহ্র প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি অন্য কিছু প্রাপ্ত হবে সে যেন নিজেকেই ভর্ৎসনা করে।' (সহীহ্ মুসলিম-৬২৪৬)

কবীরা গুনাহ্র সমকক্ষ অথবা তা থেকেও বেশী ক্ষতিকারক এরকম সকল কাজও কবীরা গুনাহ্র অন্তর্গত, যদিও কুরআন-হাদীসে সে সকল কাজের নামোল্লেখ নেই। যেমন হিরোইন জাতীয় মাদক দ্রব্য সেবন মদের চাইতে বহুগুন ক্ষতিকারক; ছিন্তাই, ডাকাতি, হুমকি দিয়ে চাঁদাবাজি প্রায় সব ক্ষেত্রেই চুরির চেয়েও ভয়ঙ্কর প্রক্রিয়ার কাজ; তাই এসব অভ্যাস বা কাজ কবীরা গুনাহ্র অন্তর্গত।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সগীরা বা ছোট গুনাহকেও মামুলী মনে করে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে যদি তা করা অব্যাহত রাখে তবে তাও কবীরা গুনাহ্ হিসেবে পরিগণিত হয়ে যায়।

কুরআনে মানুষের জন্য ক্ষমা লাভের দিক নির্দেশনা

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلاً كَرِيْمًا.

৪:৩১। তোমাদেরকে নিষেধকৃত মহাপাপসমূহ (কবীরা গুনাহ্) থেকে যদি তোমরা বিরত থাক, তা হলে *আমরা* তোমাদের লঘু পাপগুলি ক্ষমা করে দেব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে (জান্নাতে) প্রবিষ্ট করবো।

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

৪:১১০। আর কেউ যদি দুষ্কর্ম করে অথবা নিজের নফ্সের প্রতি যুলুম করে,

অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহ্‌কে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু হিসেবে পাবে। (অর্থাৎ ক্ষমা লাভ করবে)। অনুরূপ - ৩:১৩৫।

نَبِّئْ عِبَادِىْ اَنِّىْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

১৫:৪৯। (হে নবী), আমার বান্দাদের কাছে ঘোষণা করে দাও যে, আমি বাস্তবিকই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَاَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ.

১৫:৫০। এবং আমার শাস্তি - সে অতি মর্মন্তুদ শাস্তি।

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

৩৯:৫৩। (হে রাসূল!) বলে দিন (আমার এ কথা) ঃ 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার (তথা পাপ) করেছ, (তারা) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না; (ক্ষমা প্রার্থনা করলে) নিশ্চয় আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে হিদায়াতের পথে রাখুন, আমীন।

পঞ্চম অধ্যায় : পরিশিষ্ট

৫.১। জান্নাত ও জাহান্নাম কি?

কুরআনে বেহেশত বা জান্নাত (চির শান্তিময় বাগান) ও দোযখ বা জাহান্নাম (প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ড)-এর বর্ণনা অত্যন্ত চিত্রধর্মী, যেন মানুষ তার চরম পরিণতির দুটি মাত্র সম্ভাবনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে এবং সে-অনুযায়ী উপযুক্ত প্রস্তুতি নিতে পারে। বেহেশ্তের নিয়ামাতরাজি যে-রকম অসীম বৈচিত্র এবং সুখ ও তৃপ্তিদায়ক হবে, তেমনি দোযখের পরিবেশ হবে কল্পনাতীতভাবে চরম কষ্ট ও লাঞ্ছনার।

কুরআনে বর্ণিত জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা ৩.৫ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

তবে এটা মনে রাখতে হবে যে, মানুষের পক্ষে তার ইহজাগতিক অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও কল্পনাশক্তির গণ্ডীর মধ্যে যতটুকু বর্ণনা বুঝা সম্ভব, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে ততটুকু বর্ণনাই দিয়েছেন অর্থাৎ বেহেশত ও দোযখ সম্পর্কিত কুরআনের বর্ণনা আমাদের ইহজগতের পরিচিত জিনিসের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে বটে, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা আমাদের পক্ষে জানা, বুঝা বা কল্পনাও করা সম্ভব নয়।

উদাহরণস্বরূপ, একটি সাপের আহার প্রণালীর দিকে লক্ষ্য করলে অনুমান করা যায় যে, এই প্রাণী কেবল বাঁচার তাগিদে ক্ষুধা নিবারণ করতে যখন ইঁদুর, ব্যাঙ ইত্যাদি প্রাণী আস্ত গিলতে থাকে তখন তার মুখে ঝাল, মিষ্টি, টক, নোনতা এ ধরনের কোন স্বাদ কার্যকর থাকার প্রশ্ন আসে না। সেই সাপকে যদি আল্লাহ্ তা'আলা একসময় মুখে সব রকম স্বাদ দিয়ে তাকে মানুষের মত চিবিয়ে-চুষে এই পৃথিবীতে প্রাপ্ত সকল সুস্বাদু খাদ্য উপভোগ করার ক্ষমতা দিয়ে দেন তবে সাপ অবশ্যই আল্লাহ্র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলে উঠবে, 'আল্লাহ্ তুমি সত্যিই অসীম ক্ষমতাবান, আমি তো এসকল স্বাদের কিছুই জানতাম না।' সাপটি তখন আর ইঁদুর গেলার 'আনন্দ' উপভোগ করার চিন্তা করবে না।

জান্নাত : মানুষের কল্পিত জগত

মানুষ ইহজগতে কি কি জিনিস কামনা করে? সে চায় প্রকৃতির কঠোর পরিবেশ থেকে মুক্ত, অভাবহীন, দুশ্চিন্তাহীন, ঐশ্বর্যময় ও প্রিয়জন পরিবেষ্টিত একটি সুখের জীবন। এই সীমিত কামনাটুকুও প্রায় সকল মানুষের জীবনে মরীচিকাই থেকে যায়, কারণ এই পৃথিবীকে আল্লাহ্ অনাবিল শান্তির নীড় হিসেবে নয়, বরং সে রকম একটি পরিবেশের স্থায়ী জীবন লাভের লক্ষ্যে সংগ্রামের ক্ষেত্র হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তথাপি অনাবিল সুখ-শান্তি সম্বন্ধে মানুষের ধারণা কতটুকু বিস্তার লাভ করতে পারে? শান্ত-সবুজ, স্নিগ্ধ-শীতল উদ্যানময় পরিবেশে একটি নিরাপদ বাসস্থান, যার প্রাসাদসমূহ হবে দুর্লভতম ও সুন্দরতম নির্মাণসামগ্রী দিয়ে তৈরী, যেখানে আসবাবপত্র থাকবে স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণিমাণিক্য খচিত, যার পাদদেশ দিয়ে কুল কুল শব্দে প্রবাহিত হতে থাকবে বিবিধ সুপেয় পানীয়ের বর্ণালী ঝর্ণাধারা; সেই আবাসে সে বাস করবে সুন্দরতম ও মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে, যেন এক স্বাধীন রাজা; সঙ্গে থাকবে অনিন্দ্য সুন্দরী কুমারী নারী, সেবা করার জন্য থাকবে কিশোর পরিচারকরা এবং যখন-তখন সাহচর্য দান করবে অনুরূপ স্থানের অধিবাসী ভাগ্যবান নিকটাত্মীয়, প্রিয়জন ও বন্ধুবান্ধবগণ! সেই পরিবেশে যেন কোন অভাব, ঘাটতি, দুশ্চিন্তা, ভয়, রোগ-শোক বা একঘেয়েমীর ক্লান্তি না থাকে। আর সর্বোপরি তার যৌবন এবং সুখ ও আনন্দের অনুভূতি যেন থাকে চির অক্ষয়!

জান্নাত কি তা মানুষকে বুঝাতে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে এমনই এক পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন এবং এতদসঙ্গে মানুষকে আশা ও আশ্বাস দিয়েছেন যে, পরকালে পুণ্যবান মানুষের জন্য রক্ষিত তাঁর অনুগ্রহসমূহ ইহজগতের মানুষের পরিচিত বস্তুর তুলনায় বহু বহুগুনে উত্তম যা মানুষের ধারণার বাইরে।

হাদীসে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা

জান্নাত :

সহীহ্ মুসলিমে সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, জান্নাতের এমন সব জিনিস রয়েছে যা কোন চোখ কখনো দেখে নি, কোন কান (তার বর্ণনা) কখনো শুনেনি এবং কারো কল্পনা তা অনুমান করতে পারেনি। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন, "কেউই জানে না তাদের কৃত (পুণ্য)

কর্মের পুরস্কারস্বরূপ তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কি জিনিস লুক্কায়িত আছে (আয়াত-৩২:১৭)। মুসলিম, ৬৭৮০, ৬৭৮৩। (বুখারী - ৪.৪৬৭ এ আবু হুরাইরা (রা) থেকে অনুরূপ একটি বর্ণনা আছে)

হাদীসে এসেছে, জান্নাতবাসীদেরকে বলা হবে, "হে জান্নাতবাসীগণ! তোমরা চিরকাল সুস্থ থাকবে, কখনো রোগাক্রান্ত হবে না; সর্বদা জীবিত থাকবে, কখনো মৃত্যুবরণ করবে না, সর্বদা যুবকই থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না, চিরকাল এখানেই অবস্থান করবে, কখনো এখান থেকে বের হবে না।" (মুসলিম-৬৮০২)

যাবির ইবনু আবদিল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "জান্নাতবাসী খুব খাবে এবং পান করবে, কিন্তু তাদের থুথু আসবে না, নাকে শ্লেষ্মা আসবে না এবং প্রস্রাব ও পায়খানার প্রয়োজন হবে না। তাদের শরীর দিয়ে মিশক আম্বরের মত সুগন্ধময় ঘর্ম বের হবে এবং তাতেই খাদ্য হজম হয়ে যাবে।" (সহীহ্ মুসলিম-৬৭৯৫ থেকে ৬৮০০)

আরেকটি রিওয়াইয়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাকে যে নিয়ামাত দেয়া হবে তা কখনো শেষ হবে না। তার কাপড় পুরাতন হবে না, তার যৌবনে ভাটা পড়বে না। তার জন্য জান্নাতে এমন নিয়ামাত রয়েছে যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণ শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে কল্পনাও জাগেনি। (মুসলিম-৬৮০২, ৬৮০৩)

সহীহ্ বুখারী-৬.১০৫ ও মুসলিম-৩৫২, ৩৫৩ ইত্যাদি হাদীসে আছে, কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করে যে, কিয়ামাতের দিন কি আমরা আল্লাহ্র দর্শন পাব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "পরিষ্কার আকাশে দিনের সূর্য বা রাতের পূর্ণ চন্দ্র দেখতে যেমন অসুবিধা হয় না, কিয়ামাতের দিনও তেমনি আল্লাহ্কে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না।"

আয়াত ৭৫ : ২২-২৩ এ আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই বলেন, "সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।"
(উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা কে কিয়ামাতের দিন জান্নাতীরা যদিও দেখতে পাবেন, কিন্তু তাঁর আকৃতি তথা শরীর, চেহারা, হাত বা অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কি রকম এটা মানুষের অজানা ও কল্পনাতীত এবং এ সম্পর্কে বিশ্বাস করা ব্যতীত কোন রকম কল্পনা বা অনুমান করা শরী'আয় সম্পূর্ণ নিষেধ)।

আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, মহান

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ জান্নাতবাসীদেরকে ডাকবেন : হে জান্নাতের অধিবাসীগণ! তারা বলবে, আমরা উপস্থিত আছি, হে আমাদের প্রতিপালক! সমস্ত কল্যাণ তোমার হাতে নিহিত! মহান আল্লাহ্ বলবেন : তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা বলবে, হে আমাদের রব্, আমরা কেন খুশী হব না? তুমি আমাদেরকে যে নিয়ামাত দান করেছ তা অন্য কোন সৃষ্টিকে দাওনি। মহান আল্লাহ্ বলবেন : এর চেয়েও উত্তম জিনিস আমি তোমাদের দেব না? তারা বলবে, এর চেয়েও উত্তম ও উন্নত জিনিস আর কি হতে পারে? মহান আল্লাহ্ বলবেন, আমি তোমাদের উপর আমার সন্তোষ অবতীর্ণ করব। অতঃপর আমি আর কখনও তোমাদের উপর রুষ্ট হবো না। (বুখারী-৯.৬০৯ ও মুসলিম-৩৫২ ও ৬৭৮৭)।

অন্য একটি হাদীসে আছে যে, বলা হবে, "হে জান্নাতীরা! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা তিনি পূর্ণ করতে চান।" জান্নাতীরা বলবে, আল্লাহ্ তা'আলার সব ওয়াদা তো পূর্ণ হয়েই গেছে। আমাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়েছে, আমাদের পুণ্যের পাল্লা ভারী হয়ে গেছে, আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট করানো হয়েছে, সুতরাং আর তো কিছুই বাকী নেই।" তখন পর্দা উঠে যাবে এবং তারা মহিমান্বিত আল্লাহ্কে দেখতে পাবে। আল্লাহ্র শপথ! এর চেয়ে উত্তম নিয়ামাত আর কিছুই হবে না, এটাই চূড়ান্ত নিয়ামাত। (মুসলিম, রিযাদুস্ সালেহীন ১৮৯৬ নং হাদীস)

একটি বিশুদ্ধ হাদীসে আছে যে, "জান্নাতে একশতটি শ্রেণী (জান্নাতীদের মর্যাদা অনুযায়ী) আছে। এক শ্রেণী হতে অপর শ্রেণীর দূরত্ব একশত বৎসরের দূরত্বের সমান।" তিরমিযী - ১৪৭৮।

আরো বলা হয়েছে, উপরের শ্রেণীর জান্নাতীরা অপেক্ষাকৃত নীচের শ্রেণীর জান্নাতে যেতে পারবেন এবং তথাকার জান্নাতীদের সাথে আলাপ করতে পারবেন। তবে নীচের শ্রেণীর জান্নাতীরা তাদের আমলের স্বল্পতার কারণে উপরের শ্রেণীর জান্নাতে যেতে পারবেন না। (৬৯ : ২১-২৩ এর ব্যাখ্যায় ইব্নে কাসীর, মুসনাদে আবু হাতিম থেকে)

পরকালে মানুষের দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির সীমা : পরকালে মানুষের দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির সীমা সুদূর প্রসারী থাকবে অর্থাৎ বহু দূরের জিনিসের দিকে তাকালেও তারা তা কাছে দেখতে পাবে (ইবনে উমর রাঃ এর বর্ণনায় দুই হাজার বৎসরের পথের দূরত্ব হচ্ছে সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতীর দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির সীমা)। যেমন

তৃতীয় অধ্যায়ে কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জাহান্নামীরা নিজেদের কষ্ট লাঘবের জন্য জান্নাতবাসীদের কাছে কিছু জান্নাতী নিয়ামাত প্রার্থনা করবে। তাদের কথোপকথনে পৃথিবীর হিসেবে এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, জাহান্নামীরা জান্নাতবাসীদের অতি কাছেই অবস্থান করছে, অথচ জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যকার দূরত্ব আমাদের কল্পনারও বাইরে।

জান্নাত সম্পর্কে মানুষের কল্পিত বিভ্রান্তি :

কিছু কিছু লোক পরকালকে একটি আধ্যাত্মিক অনুভূতির জগত হিসেবে ভাবেন। সূফী ইবনুল আরাবীকে (স্পেন, ১১৬৫-১২৪০ খৃ) এই ধারণার (এবং স্রষ্টাতে সৃষ্টির একীভূত হওয়ার ধারণার) একজন প্রাথমিক প্রবক্তা মনে করা হয়। তিনি পরকালের সার্বিক বিষয়কে কেবল বিভিন্ন মানসিক অবস্থার ও ধারণার মূর্ত রূপ মাত্র মনে করতেন, যে অবস্থায় শারীরিক পুনরুত্থান এবং শারীরিক কষ্ট বা উপভোগের উপস্থিতি থাকবে না, কেবল আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বর্তমান থাকবে।

এই ধারণা কুরআনের পরকাল সম্পর্কিত আয়াতসমূহে অবিশ্বাসের নামান্তর। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে পরকালের চিত্রকে কোন উপমা হিসেবে উপস্থাপন করেননি। পরকালের সম্পূর্ণ বাস্তব এবং সত্য জীবনে মানুষ তার স্বাভাবিক দেহ এবং ইহকালের সকল ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও অনুভূতি নিয়ে পুনরুত্থিত হবে এবং বিচারের রায় অনুযায়ী প্রত্যেকে নিজের কৃতকর্মের ফল লাভ করবে।

অপরদিকে আরেকদল লোক প্রশ্ন করেন যে, পরকালে জান্নাতের পবিত্র পরিবেশে যেহেতু সন্তান জন্মদানের বিষয়টি নেই, সেহেতু সেখানে জান্নাতবাসীদের যৌন সম্ভোগের সম্ভাবনা থাকবে কেন? এসব প্রশ্ন নেহায়েত অবান্তর এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টির সহায়ক। আল্লাহ্ বার বার জান্নাতবাসীদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, তারা তাদের তৃপ্তির জন্য যা চাইবে তা-ই পাবে। সুতরাং বিশেষ কোন জিনিস সেখানে অনুপস্থিত থাকবে এমন চিন্তার সুযোগ কোথায়? ইহজগতে তো সন্তান জন্মদানের সম্ভাবনা না থাকা অবস্থায়ও, তথা বয়স পার হয়ে গিয়েও, মানুষ যৌন সম্ভোগ করে। একাধিক সহীহ্ হাদীসে উল্লেখ আছে, জান্নাতে স্বামী-স্ত্রীরা দৈহিক মিলনের আনন্দ উপভোগ করবেন।

ইবনে কাসীর ৫৬:৩৬-৩৮ আয়াতের তাফসীরে (তিবরানী রঃ থেকে) লিখেন :

হাদীসে আছে, নবী (সা) এর নিকট এক বৃদ্ধা মহিলা এসে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আমার জন্য দু'আ করুন যেন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করেন।" রাসূল (সা) তাকে বললেন, "হে অমুকের মা! কোন বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না।" (এ ছিল একটি রসিকতা, তবে সত্য বিষয়ের উপর)। বৃদ্ধা মহিলাটি তখন কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, (হে আমার সাহাবী বর্গ!) তোমরা তাকে খবর দাও যে, বৃদ্ধাবস্থায় কেউ জান্নাতে যাবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে, তাদেরকে করেছি কুমারী।" (অর্থাৎ এ দুনিয়ায় যত বয়সের বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা হয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করুক না কেন সকল জান্নাতী পরকালে যৌবন প্রাপ্ত হয়ে, বিশেষত নারীরা অতি সুন্দরী, সম্পূর্ণরূপে কুমারী ও নব যুবতী হয়ে সৃষ্ট হবে। আর পুরুষরা চুলবিহীন, শ্মশ্রুবিহীন, গৌরবর্ণের, উত্তম চরিত্র বিশিষ্ট, সুন্দর, কাজল কালো চক্ষু বিশিষ্ট, তেত্রিশ বৎসর বয়স্ক (ঈসা আঃ এর মত); ষাট হাত দীর্ঘ ও সাত হাত চওড়া, মযবুত দেহবিশিষ্ট হবে এবং সদা-সর্বদা ঐ বয়সেই থাকবে। (তিরমিযী)।

আবু হুরাইরা (রা) জিজ্ঞেস করেন, "জান্নাতে জান্নাতী লোক স্ত্রী সঙ্গমও করবে কি?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "হ্যাঁ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে সেই আল্লাহ্‌র শপথ! সত্যি জান্নাতে জান্নাতবাসী স্ত্রী সঙ্গম করবে এবং খুব ভালভাবে উত্তম পন্থাতেই করবে। যখন তারা পৃথক হবে তখই স্ত্রী এমনই পাক সাফ কুমারী হয়ে যাবে যে, তাকে যেন কেউ স্পর্শই করেনি।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেছেন, একজন জান্নাতীর বাহাত্তর জন করে স্ত্রী (হুর) থাকবে যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট। আর দুটি করে স্ত্রী থাকবে আদম সন্তানের মধ্য থেকে। এদেরকে এদের ইবাদাতের কারণে অন্য সমস্ত স্ত্রীর (হুর) উপরে ফযীলত দেয়া হবে। জান্নাতী ব্যক্তি তাদের এক এক জনের কাছে যাবে। শান্তি ময় মিলনে কেউই ক্লান্ত হবে না। সেখানে কোন বিশেষ পানি (শুক্র) থাকবে না যাতে ঘৃণা আসে। তারা দুজন এভাবে লিপ্ত থাকবে এমতাবস্থায় জান্নাতী ব্যক্তির কানে আসবেঃ "এটা তো আমাদের খুব ভাল জানাই আছে যে, কারো মনের আকাঙ্ক্ষা মিটবে না, কিন্তু আপনার অন্যান্য স্ত্রীরাও তো আছে। তখন ঐ জান্নাতী ব্যক্তি বের হয়ে আসবে এবং আরেক জনের কাছে যাবে। (জান্নাতী লোকের স্ত্রীদের মধ্যে ইহকাল সুলভ কোন রকম হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না, এক স্বামী নিয়েই সকলে সুখী ও সন্তুষ্ট থাকবে)। যার কাছে সে ব্যক্তি যাবে সেই তাকে

দেখে বলে উঠবে: "আল্লাহ্‌র কসম! জান্নাতে আমার জন্য আপনার চেয়ে ভাল জিনিস আর কিছুই নেই। আপনার চেয়ে অধিক ভালবাসা আমার আর কারো প্রতি নেই।" আনাস (রা) জিজ্ঞেস করেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! এত ক্ষমতা একজন জান্নাতী রাখবে ?" জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "একশত জন লোকের শক্তি তাকে দেয়া হবে।" (তিরমিযী-১৪৮২)

উম্মে সালমা (রা) প্রশ্ন করেছিলেন, "হে রাসূলুল্লাহ্ (সা)! কোন কোন স্ত্রীলোকের দুটি, তিনটি এমনকি চারটিও স্বামী হয়ে যায়। মৃত্যুর পর যদি এই স্ত্রীলোকটি জান্নাতী হয়ে যায় এবং তার সব স্বামীও জান্নাতী হয়ে যায় তবে সে কার সাথে মিলিত হবে?" রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তরে বলেন, "তাকে অধিকার দেয়া হবে সে যার সাথে ইচ্ছা মিলিত হতে পারে। দুনিয়ায় তার সাথে যে ভাল ব্যবহার করত সে ঐ স্বামীকে বেছে নেবে।"

আল্লাহ্‌র ওয়াদাকে অলীক মনে করা কুফরীর সামিল বৈকি।

প্রকৃতপক্ষে কে কোন্ বিষয়ে আনন্দ পেতে চাইবে তা তার মানসিক পূর্ণতা ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার উপর হয়ত নির্ভর করবে। যেমন ইহজগতে একটি শিশু তার পুতুল ও অনুরূপ খেলনাকেই সবচাইতে প্রিয় বস্তু ভাবে, কিন্তু বড় হয়ে সেই খেলনার প্রতি তার আর কোন আর্কষণ থাকে না, তখন তার জন্য প্রিয়জনের সান্নিধ্য হয়ে উঠে আরো আনন্দের। পরকালে তেমনি সকল বস্তুর উপস্থিতির মধ্যেও যারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনে সবার অগ্রবর্তী থাকবেন তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, দর্শন ও সান্নিধ্যের অসীম আধ্যাত্মিক আনন্দ ও তৃপ্তিতে বিভোর থাকবেন, অন্যান্য বস্তুতে তারা হয়ত তেমন আর্কষণ অনুভব করবেন না। এটা পূর্বে দেয়া উদাহরণের মত, যেমন সাপ সকল রকম সুস্বাদু খাদ্য উপভোগ করার ক্ষমতা পেয়ে গেলে তখন আর ইঁদুর গেলার 'আনন্দ' উপভোগ করার চিন্তা করবে না। আল্লাহ্ই সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত।

অনেকে এও প্রশ্ন করেন, জান্নাতে পুরুষের জন্য সঙ্গিনী হিসেবে অপরিসীম সৌন্দর্য্যের অধিকারী হুরগণ উপস্থিত থাকবে, অথচ নারীদের বেলায় তাদের জন্য অনুরূপ কোন সুপুরুষ থাকবে এমন আশ্বাস নেই কেন? প্রকৃতপক্ষে নারী মনের চাওয়া বা নারীর চাহিদা কি তা তো আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত। তবে বাহ্যতঃ সতী নারীরা একাধিক পুরুষসঙ্গ কামনা করে না, এটাই তাদের সহজাত প্রবৃত্তি। পরকালে জান্নাতবাসী নারীগণ আপন পুণ্যবান স্বামী এবং নিকটাত্মীয়দের

সাহচর্য (আয়াত ৪৩:৭০ - ৭১) এবং চিরকিশোর সেবকবৃন্দের সেবা (৫৬:১৭, ৭৬:১৯) আর কাম্য সকল ভোগ্যবস্তু পাবেন (৫৬:১১ - ৫৬:৪০ ইত্যাদি)। তদুপরি যদি কোন নারী একাধিক পুরুষের সঙ্গ সেখানে কামনা করেনই, তাহলে সব কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ্ তো জান্নাতী বান্দাদের চাহিদা পূরণে ওয়াদাবদ্ধ, কেননা তিনি তো বলেছেন তাঁর পুণ্যবান বান্দারা জান্নাতে যা চাইবে তাই তাদেরকে দেয়া হবে (৪১:৩১, ২১:১০২)।

হাদীসে জাহান্নামের বর্ণনা :

পরকালে জান্নাতের নিয়ামাতরাজি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা যেমন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনি পরকালের শাস্তির প্রচণ্ডতা সম্পর্কেও মানুষ যথার্থ কোন ধারণা করতে পারবে না। শেষ বিচারের পর পাপীদের শাস্তি প্রদানের জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে যে স্থান, তা-ই হচ্ছে জাহান্নাম, কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী যার প্রধান উপাদান হচ্ছে প্রজ্জলিত আগুন।

জাহান্নামের আগুন কতটুকু উত্তপ্ত হবে তার প্রকৃত অবস্থাও কেবল আল্লাহ্ই জানেন। পৃথিবীতে সাধারণ দাহ্য পদার্থের সৃষ্ট আগুনের তাপমাত্রা যেখানে সাধারণতঃ এক হাজার থেকে তিন হাজার ডিগ্রি সেঃ পর্যন্ত উঠে, (প্রাণীর মাংশ একশত ডিগ্রি সেঃ এর উপরের তাপমাত্রায় গলতে শুরু করে), সেখানে সূর্যের তাপমাত্রা বিভিন্ন গভীরতায় কয়েক লক্ষ ডিগ্রি সেঃ পর্যন্ত। ঐ তাপমাত্রায় যে কোন বস্তু তাৎক্ষণিকভাবে বিষ্ফোরিত হয়ে বায়বীয় অথবা আণবিক অবস্থায় রূপ নেবে। জাহান্নামের আগুনের তাপমাত্রা মানুষের অজানা, তথাপি পূর্বের অধ্যায়সমূহে আলোচিত কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে এটুকু জানা যায় যে, সে আগুনের তাপমাত্রাও ভয়াবহ।

জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ ও জাহান্নামীদের ন্যুনতম শাস্তি :

হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জাহান্নামের উত্তাপ কী পরিমাণ হতে পারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে তা পৃথিবীর আগুনের সত্তর গুনের সমান (সহীহ্ বুখারী ৪.৪৮৭)। কোন কোন হাদীসে এর চেয়ে বেশীও বলা হয়েছে। আর জাহান্নামীদের শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে তিনি বলেন, জাহান্নামে যে লোকটির শাস্তি সবচেয়ে হালকা হবে তা হবে এই যে, তার পায়ে আগুনের জুতা পরানো হবে, যার ফলে তার মাথার খুলি টগবগ করে ফুটতে থাকবে। সে তখন

মনে করবে যে, তাকেই সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি দেয়া হচ্ছে। (সহীহ্ বুখারী - ৮.৫৬৬)

জাহান্নামবাসীদের জন্য সবচাইতে বড় দুঃসংবাদ তো এই যে, পরকালে যেহেতু আর মৃত্যু নেই, তাদেরকে সেখানে চিরকাল থাকতে হবে, যদি না আল্লাহ্ তাদের কারো প্রতি অনুগ্রহ করেন।

জাহান্নামের সার্বিক পরিবেশ, জাহান্নামবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার্য ও পানীয় সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা পূর্বের অধ্যায়সমূহে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এখানে হাদীসে বর্ণিত কিছু শাস্তির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে যা বিশেষ বিশেষ পাপের কারণে পাপীরা পরকালে ভোগ করবে। মূল হাদীসগুলি দীর্ঘ হওয়ার কারণে শুধু সারসংক্ষেপ উদ্ধৃত করা হলো।

১। ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) একবার দুটি কবরের কাছ দিয়ে যচ্ছিলেন। এ সময় তিনি বললেন, এদের আযাব দেয়া হচ্ছে, কোন কঠিন পাপের জন্য তাদের আযাব হচ্ছে না। এদের একজন তার পেশাবের নাপাকী থেকে সতর্ক থাকত না, আর অপর জন চোগলখোরী করে বেড়াতো। (সহী বুখারী ২১৬, ২১৮)।

২। সামুরা ইব্নু জুনদাব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, এক রাত্রে স্বপ্নে জিব্রাঈল ও মিকাঈল (আ) ফিরিশ্তাদ্বয় তাঁকে নিয়ে চলতে চলতে দেখান (ক) এক দণ্ডায়মান ব্যক্তি এক উপবিষ্ট ব্যক্তির (একপাশের) চোয়াল এমন ভাবে বিদ্ধ করছিল যে তা (চোয়াল বিদীর্ণ করে) মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ পর্যন্ত পৌছে যাচ্ছিল। তার পর অপর চোয়ালটি পূর্ববৎ বিদীর্ন করল। ততক্ষণে প্রথম চোয়ালটি জোড়া লেগে যাচ্ছিল। আকড়াধারী ব্যক্তি পুনরায় সেরূপ করছিল। চোয়াল বিদীর্ণ হওয়া লোকটি কে? এই প্রশ্নের উত্তরে জিব্রাঈল (আ) বলেন, সে ছিল মিথ্যাবাদী, সে মিথ্যা বলে বেড়াতো যা ক্রমাগত বর্ণিত হয়ে দূর দূরান্তে পৌছে যেত। (খ) তার পর তিনি (সা) দেখেন চিৎ হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির মাথা তার শিয়রে দাঁড়ানো এক ব্যক্তি পাথর দ্বারা চূর্ণ করে দিচ্ছিল। নিক্ষিপ্ত পাথর আবার তুলে নিয়ে ফিরে আসতে বিচূর্ণ মাথা পূবর্বৎ জোড়া লেগে যাচ্ছিল। সে পুণরায় মাথার উপরে পাথর নিক্ষেপ করছিল। জিব্রাঈল (আ) বললেন, মাথা চূর্ণ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ কুরআনের জ্ঞান দান করেছিলেন। কিন্তু রাতের বেলায় কুরআন থেকে বিরত হয়ে (নামায না পড়ে) সে নিদ্রা যেত এবং দিনের বেলায় কুরআন

অনুযায়ী আমল করত না। (গ) আরো অগ্রসর হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দেখেন চুলার মত একটি গর্ত যার উপরভাগ সংকীর্ণ এবং নীচের ভাগ প্রশস্থ। তাতে আগুন জ্বলছে এবং আগুন উঠা নামার সাথে সেথায় বহুসংখ্যক উলঙ্গ নর-নারী আগুনের সাথে গর্তের মধ্যে উঠানামা করছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে জানানো হয়, তারা সকলে ব্যভিচারী নর-নারী (ঘ) তৎপর তিনি দেখতে পান একটি রক্তের নদীর মাঝেখানে একটি লোক, সে ওখান থেকে বের হওয়ার জন্য অগ্রসর হলেই তীরে দাড়ানো এক ব্যক্তি তার মুখ বরাবর পাথর ছুড়ে মারছে, এতে সে আবার মাঝখানে ফিরে যাচ্ছে। নদীর মাঝখানের এই লোক ছিল সুদখোর। জিব্রাঈল (আ) বলেন, এদের প্রত্যেকের সাথে কিয়ামাত পর্যন্ত এরূপ করা হবে। .....সহীহ্ বুখারী - ১৩০৩ ও সহীহ্ মুসলিম - ১৫৪৬। (সারসংক্ষেপ)

৩। মি'রাজের সময়ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে জান্নাত ও জাহান্নামের দৃশ্য দেখানো হয় এবং জাহান্নামের দৃশ্যে তাঁর উম্মতের মধ্যকার পাপীদের বিভিন্ন পাপের শাস্তি দেখানো হয়। মি'রাজ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়াইতে অনেকগুলি সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যেগুলি থেকে কয়েকটি শাস্তির দৃশ্য বর্ণনা করা হলো (তাফসীরে ইবনে কাসীর ১৭:১ আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে) :

(ক) মৃতদেহ ভক্ষণকারী এক দল লোক : এরা ছিল পরনিন্দাকারী।

(খ) তামার নখওয়ালা এক দল লোক যারা নিজেদের মুখমণ্ডল ও বক্ষ খামচাচ্ছিল : এরাও মানুষের গীবত করত এবং মানহানি করতো।

(গ) পরিষ্কার ও ভাল ভাজা মাংসের বদলে পচা দুর্গন্ধময় ভাজা মাংস ভক্ষণকারী দল : এরা হালাল বাদ দিয়ে হারাম কাজ করত বা হারাম জিনিস খেত। নিজের হালাল স্ত্রী ছেড়ে পরনারীর কাছে যেত অথবা হালাল স্বামী ছেড়ে অন্য পুরুষের কাছে যেত।

(ঘ) বিশাল ঠোঁটওয়ালা কিছু লোকের ঠোঁট কেটে তা তাদের মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে (ফিরিশ্তা কর্তৃক) এবং তা তাদের পশ্চাদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে : এরা ছিল ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎকারী।

(ঙ) নিজেদের বুকের ভরে লটকানো কয়েকটি স্ত্রীলোক : এরা ব্যভিচারিণী।

(চ) বড় বড় ঘরের মত পেটওয়ালা কিছু লোক চলতে চাচ্ছে কিন্তু পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারছে না : এরা সুদখোর।

(ছ) কিছু লোকের পার্শ্বদেশ হতে ফিরিশতারা মাংস কেটে তাদেরকেই খাওয়াচ্ছেন : এরা ছিল চোগলখোর এবং অন্যের দোষ অন্বেষণকারী।

(জ) একটি লোক বিরাট স্তুপ জমা করছে কিন্তু কিছুতেই উঠাতে পারছে না, অথচ আরো বাড়াতে রয়েছে : সে এমন এক লোক যার উপর মানুষের এত বেশী হক বা প্রাপ্য আছে যা শোধ করার তার ক্ষমতা নেই, তথাপি সে নিজের উপর দেনার ভার বাড়িয়ে নিচ্ছে এবং জনগণের আমানত গ্রহণ করতেই আছে।

(ঝ) এক দল লোকের মাথা পাথর দ্বারা পিষ্ট করা হচ্ছে : এরা ঐসব লোক যাদের মাথা ফরয নামাযের সময় ভারী হয়ে যেত (নামায তরককারী)।

(ঞ) কিছু লোক যাদের সামনে ও পেছনে বস্ত্রখণ্ড লটকানো আছে এবং তারা উট ও অন্যান্য জন্তুর মত জাহান্নামের কাঁটাযুক্ত গাছ খাচ্ছে এবং দোযখের পাথর ও অঙ্গার ভক্ষণ করছে : এরা মালের যাকাত দিত না।

(ট) এক দল লোকের জিহ্বা ও ঠোঁট লোহার কেঁচি দ্বারা কর্তন করা হচ্ছে, তা আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছে এবং আবার কাটা হচ্ছে এবং এই অবস্থা অব্যাহত আছে : এরা হচ্ছে ফিৎনা ফ্যাসাদের সৃষ্টিকারী বক্তা ও উপদেষ্টা।

জান্নাতের স্তরভেদে যেমন একাধিক নাম আছে যথা ফিরদাউস, আদন, নাঈম ইত্যাদি, তেমনি জাহান্নামেরও একাধিক নাম আছে, যেমন জাহীম, সাকার, হাবিয়াহ, হাফিরাহ, লাযা, হুতামাহ্ ইত্যাদি।

কিয়ামাতের দিন চূড়ান্ত বিচার শেষে যারা জাহান্নামী সাব্যস্ত হবে তারা তো সরাসরি জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে এই পরিণাম থেকে রক্ষা করুন !

(লক্ষ্য করার বিষয় যে, পূর্ববর্তীকালের কোন কোন নবীর উম্মতরা একটি মাত্র কবীরা গুনাহ্তে লিপ্ত হওয়ার কারণে তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়া হয়, অথচ আজকের যুগে আমাদের অনেক জনগোষ্ঠী পূর্বের সেই সব পাপী উম্মতদের সকলের করা সব ধরনের পাপকার্যে লিপ্ত হয়েও সে রকম শাস্তি (প্রাপ্য হয়েও) থেকে বেঁচে যাচ্ছে। এর কারণ, রাহ্মাতুললিল আলামীন রাসূল (সা) এর আল্লাহ্র কাছে করা দু'আ, যাতে তিনি চেয়ে ছিলেন তাঁর উম্মাতকে যেন পূর্ববর্তীদের ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া না হয়, আর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার রাসূলের (সা) সেই দু'আ কবুল করেছিলেন)।

জান্নাত ও জাহান্নাম কি তৈরী হয়ে আছে?

মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবুল-ইয্‌য আল-হানাফী তাঁর শরহ্‌ তাহাওয়ীয়াহ্‌ গ্রন্থে বলেন, 'আহলুস্‌ সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামা'হ বিশ্বাস করেন যে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়ে গেছে এবং বর্তমানে তা অস্তিত্বশীল।' এর সপক্ষে একাধিক হাদীসও আছে যেগুলিতে নবী (সা) কে জান্নাত ও জাহান্নামের বিভিন্ন দৃশ্য দেখানো হয়েছে বলে বর্ণিত আছে।

জান্নাত ও জাহান্নাম তৈরী হয়ে আছে এই মর্মে বহু বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত আছে, যার কয়েকটি উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আরেকটি হাদীসে আছে, আব্দুল্লাহ্‌ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত,

"..... (এক দিন সূর্য গ্রহণের সালাত শেষে) লোকজন জিজ্ঞেস করল, 'হে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)! আমরা দেখলাম যে আপনি (সালাতে রত অবস্থায়) নিজ স্থান থেকে কিছু একটা ধরছেন এবং পরক্ষণেই হাত গুটিয়ে নিলেন।' রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) উত্তর দিলেন, 'আমি জান্নাত দেখতে পেলাম এবং এক গুচ্ছ ফলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম, আর আমি তা পেয়ে গেলে তোমরা তা থেকে দুনিয়া স্থায়ী থাকা পর্যন্ত খেতে পারতে। আমি জাহান্নামের আগুনও দেখলাম, আর তার চেয়ে ভয়াবহ দৃশ্য আমি কখনো দেখিনি.....।" বুখারী-২.১৬১

কুরআনে জাহান্নামের অস্তিত্বের কথা ৪০:৪৬ আয়াতে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, "সকাল সন্ধ্যায় তাদেরকে (ফির'আউন ও তার দলবলকে) উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে.....।" কবরে তথা আলমে বারযাখে থাকা অবস্থায় কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত তাদের এ শাস্তি চলতে থাকবে।

অবশ্য মুতাযিলা এবং কাদারিয়্যাহ্‌ ফিরকার সমর্থকরা 'বিচার দিবসের পূর্বে জান্নাত বা জাহান্নামের অস্তিত্ব থাকা অপ্রয়োজন' - এই ধরনের মনগড়া ও অনর্থক যুক্তি খাঁড়া করে বলেছে, 'এগুলো এখন অস্তিত্বহীন, আল্লাহ্‌ পুনরুত্থান দিবসে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করবেন'।

৫.২। কুরআনুল কারীমের মূল বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত তালিকা

মানবজাতিকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য যে-সকল বিষয়ের তথ্য ও জ্ঞান মানুষের জন্য প্রয়োজন, তার সবকিছুই আল্লাহ্‌ তা'আলা কুরআনে নাযিল

করেছেন। কুরআনের কিছু আয়াত হচ্ছে সরাসরি নির্দেশ, যা মানুষকে পালন করতে হবে, আর বাকী আয়াতসমূহে আছে সৎকর্মের উপদেশ, বিবিধ রকমের উপমার সাহায্যে নসীহত, নবী ও সৎলোকদের জীবন কাহিনী, বিভিন্ন যুগের ঘটনাবলী, সৃষ্টি-রহস্য সম্পর্কিত জ্ঞান-বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য ইত্যাদি।

মানবজাতির জন্য পালনীয় বিধান বা শরী'আর নির্দেশ সম্বলিত কুরআনের আয়াতসমূহ বেশীরভাগই স্পষ্ট ও সহজ বোধ্য। তবে এসব অবশ্যকরণীয় নির্দেশনাবলী পালনের বিস্তারিত নিয়মকানুন ও আনুষ্ঠানিকতার বিষয়াদি কুরআনে নাযিল না করে আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলি তাঁর শেষ রাসূল মুহাম্মদ (সা) এর মাধ্যমে ঈমানদারগণকে বাস্তবে শিখিয়ে দিয়েছেন, যাতে প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াটি সহজ হয়। কুরআনে বহু আয়াত আছে যা সর্বস্তরের লোকের জন্য সহজে বোধগম্য না হওয়া সত্ত্বেও তাফসীরকারকগণের ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে সে-সব আয়াতের অর্থ স্পষ্ট হয়ে উঠে। কুরআনে কিছু সংখ্যক অক্ষর-সমষ্টি, শব্দ এবং বাক্যও আছে যে-সবের সঠিক অর্থ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। ঈমানদারগণের জন্য এটুকু বিশ্বাসই যথেষ্ট যে এসব শব্দ বা বাক্য আল্লাহ্র বাণীরই অংশ বিশেষ, এসবের প্রতি কোন রকম অনুমান ভিত্তিক অর্থ আরোপ করার প্রয়োজন নেই এবং উচিতও নয়, যদিও বিভিন্ন যুক্তিতে কেউ কেউ কিছু সম্ভাব্য অর্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে বলেছেন,

৩:৭। (হে রাসূল!) তিনি (আল্লাহ্)-ই আপনার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার কতেক আয়াত 'মুহকামাত' (সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন), - এগুলি হচ্ছে কিতাবের মূল, আর অন্যগুলি হচ্ছে 'মুতাশাবিহাত' (পুরাপুরি স্পষ্ট নয়, রূপক বা উপমা)। তবে যাদের অন্তরে কুটিলতা আছে তারাই শুধু ফিতনা (বিভেদ ও বিভ্রান্তি) সৃষ্টি ও (কুরআনের) অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে রূপক আয়াতের অংশ বিশেষ অনুসরণ করে। কিন্তু (প্রকৃত পক্ষে) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ এসব (রূপক) আয়াতের (অন্তর্নিহিত) ব্যাখ্যা জানে না। আর যাদের জ্ঞানের ভিত্তি সুগভীর তারা বলে, 'আমরা এ কিতাবে বিশ্বাস করি, এর সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে (আগত)'; এবং বোধসম্পন্ন লোকেরা ব্যতীত কেউ এর শিক্ষা গ্রহণ করে না।

কুরআনে বর্ণিত সকল বিষয়াদির একটি সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করা যায় বটে, তবে নিম্নে মূল বিষয়গুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেয়া হল :

১। তৌহীদ : আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও তাঁর একত্বের স্পষ্ট ধারণা এবং আল্লাহ্‌র একক গুণাবলীসমূহের বর্ণনা, - যা ঈমানের মূল ভিত্তি। এতদসঙ্গে ঈমানের অন্যান্য আবশ্যিক শাখা প্রশাখার বর্ণনা।

২। খিলাফাত : মানব-সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও তাদেরকে পৃথিবীতে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রতিনিধি (খলীফা) হিসেবে প্রেরণের প্রক্রিয়ায় আদি পিতা-মাতার সৃষ্টি ও তাঁদের পৃথিবীতে আগমণ-পূর্ব ঘটনাবলী।

৩। আখিরাত : ইহজগতে মানবজাতির স্বল্পকালীন উপস্থিতির পর কিয়ামাত পর্বে পৃথিবীসহ সৃষ্টির সবকিছু ধ্বংস, পুনর্গঠন ও পুনরুত্থান শেষে পরকালে শেষ বিচারের ভয়াবহ দিনে মানুষের কৃতকর্মের জবাবদিহিতার জন্য তাদের স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখীন হওয়া এবং বিচার শেষে রায় অনুযায়ী তাদের বেহেশত বা দোযখের আগুনে চিরকাল থাকার অনন্ত জীবনে পদার্পণ করার প্রক্রিয়ার বর্ণনা।

৪। রিসালাত : ইহজগতে মানুষকে শয়তানের প্ররোচনা থেকে দূরে রাখার অভিপ্রায়ে আল্লাহ্ কর্তৃক যুগে যুগে রাসূলগণকে হিদায়াতকারী হিসেবে পাঠানো এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের সংগ্রামের ইতিহাস। তৎসঙ্গে রাসূলগণকে অস্বীকার ও অমান্য করার কারণে বিভিন্ন অবিশ্বাসী কওমদের ভয়ঙ্কর পরিণামের বর্ণনা।

৫। শরী'আ : পরকালের সাফল্য তথা পরকালে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামাত লাভ এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে মানুষের ইহজগতে করণীয় সকল বিষয়ের নির্দেশাবলী, যা স্পষ্টভাবে আদেশ বা নিষেধ হিসেবে ঘোষিত। প্রত্যেক জাতির জন্য তাদের রাসূলগণের কাছে ওহীর মাধ্যমে শরী'আর বিধান প্রেরিত হয়। কুরআনুল করীম মানব জাতির জন্য শেষ ও পূর্ণাঙ্গ শরী'আ।

৬। নসীহত : স্পষ্ট নির্দেশ (ফরয) ছাড়াও কুরআনে সর্বত্র হিতোপদেশ, সতর্কবাণী, পাপ বা পুণ্যকর্মের ঘটনা ও সেগুলির ফলাফল, উপমা বা রূপক গল্প এবং অতীতের বহু ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে– যেগুলি থেকে মানুষ শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

৭। সৃষ্টি বৈচিত্র্য ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান : আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান সুদৃঢ় করার পন্থা হিসাবে মানুষকে সৃষ্টির প্রতি তাকিয়ে সৃষ্টি-বৈচিত্র্য অবলোকন করার ও চিন্তা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতা ও অনুগ্রহের বিষয়ে জ্ঞান

অর্জন করার জন্য কুরআনে অসংখ্য 'আয়াত' বা আল্লাহ্‌র নিদর্শনের কথা উল্লিখিত হয়েছে যেন তা স্মরণ করে মানুষ রাহ্‌মানুর রাহীমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে। এসব নিদর্শনের মধ্যে এমন অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যও আছে যার ব্যাখ্যা মানুষের জ্ঞান বিস্তারের সাথে সাথে ধীরে ধীরে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

৮। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের অতিরিক্ত দিক নির্দেশনা : আল্লাহ্ তা'আলাকে একমাত্র উপাস্য হিসেবে মেনে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের অঙ্গীকার (খিলাফাত) এর দায়িত্ব ছাড়াও কুরআনে আরো কিছু আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও সাধনার পথের নির্দেশ আছে যা মানুষকে তাঁর স্রষ্টা ও প্রতিপালকের নৈকট্য লাভে সহায়তা করে। সেগুলি হচ্ছে জিহাদ (আল্লাহ্‌র পথে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে ধৈর্য সহকারে সংগ্রাম), তাকওয়া (আল্লাহ্‌ভীতি), যিক্‌র (আল্লাহ্‌কে সর্বাবস্থায় স্মরণ করা), সব্‌র (ধৈর্য ধরা কিন্তু নিষ্কর্মা না হয়ে সৎপথে থাকার চেষ্টায় থাকা), তাওয়াক্কুল (সকল কাজে এবং অবস্থায় আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল থাকা) ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত নসীহত।

কুরআনুল কারীমের আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট হচ্ছে, এতে সন্নিবেশিত হাজার হাজার বছরের ইতিহাস ও ঘটনাবলীর মধ্যে যুগের পরিবর্তনেও কোন রকম অসামঞ্জস্যতা বা অমিল পরিলক্ষিত হয় না, কোন অযৌক্তিক বা বিজ্ঞান বহির্ভূত বিষয় বা ধারণাও এতে খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ মানুষের প্রচলিত রীতি-নীতি ও ধ্যান-ধারণা প্রায়শই কালক্রমে ভুল প্রমাণিত ও পরিত্যক্ত হয়ে যায়।

(উপরোক্ত ক্রমিক নং ৩ এর বিষয় হচ্ছে এই পুস্তকের মূল আলোচ্য বিষয়। আনুষঙ্গিক বিষয় হিসেবে ক্রমিক নং ২ এর বিষয় প্রথম অধ্যায়ে এবং ক্রমিক নং ১ এর বিষয় শেষ অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তাকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।)

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা দিন। আমীন।

৫.৩। বিগ ব্যাং (Big Bang) - মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক সূত্র :

মহাবিশ্বের সৃষ্টি কখন কিভাবে ঘটেছিল তা নির্ধারণ করতে বিজ্ঞানীগণ বিবিধ মহাজাগতিক বস্তুর গতি-প্রকৃতি বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এর মধ্যে আছে মহাবিশ্বের ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণের গতির পশ্চাৎমুখী হিসাব, মহাজাগতিক

মাইক্রোতরঙ্গের অবশিষ্টাংশের বিকীরণের তাপমাত্রার তারতম্যের মাপ এবং গ্রহপুঞ্জসমূহের মধ্যকার প্রকৃতিগত আপেক্ষিক অবস্থার মাপ ইত্যাদি। এসব মাপজোকের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা সৃষ্টির শুরুর যে চিত্র এঁকেছেন তাকে তারা আখ্যা দিয়েছেন Big Bang বা মহাবিস্ফোরণ মডেল। এই মডেল বা সূত্র অনুযায়ী আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশত কোটি বৎসর পূর্বে অসীম ঘনত্বের এক আয়তনবিহীন (মহাসূক্ষ্ম) বিন্দুতে প্রচণ্ড ক্ষমতার অজ্ঞাত কোন উৎস থেকে অসীম তাপমাত্রার বর্ণনাতীত পরিমাণ শক্তি ঘনীভূত হয় এবং এর ফলে অতি সূক্ষ্ম সময়ের মধ্যে তথায় এক মহাবিস্ফোরণ ঘটে। মাত্র এক সেকেন্ডের কোটি কোটি কোটি ভাগের একভাগ (শূন্য সময় বা তাৎক্ষণিক) সময়ের মধ্যেই এই মহাবিস্ফোরণের ফলে ঘটে যায় মহাগতির এক মহাসম্প্রসারণ এবং সৃষ্টি হয়ে যায় ক্রম সম্প্রসারণশীল এই মহাবিশ্বের। মহাবিশ্বের তাৎক্ষণিক এই সম্প্রসারণের ফলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এর তাপমাত্রা কমে গিয়ে নেমে আসে প্রায় ১০০ কোটি সেলসিয়াসে। তখন বিকীরণ অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে শুরু হয় মৌল পদার্থের অণুর সৃষ্টি - নিউট্রন, প্রোটন ইত্যাদির। প্রায় চার লক্ষ বৎসর পর ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের মিশ্রণে সৃষ্ট হয় প্রথম কয়েকটি অণু - হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম ইত্যাদি। তার পর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিকাশ ঘটে এবং অতি উত্তপ্ত গ্যাসীয় বলয়সমূহ থেকে শুরু হয় গ্যালাক্সী বা নক্ষত্রপুঞ্জসমূহের সৃষ্টি। বিজ্ঞানীদের ধারণা, মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ এখনও চলছে এবং ক্রম দ্রুততর গতিতে।

বিগ ব্যাং সূত্র এটা অনুমান করে না যে, মহাবিস্ফোরণের পূর্বে বিশ্বে একটি খালি জায়গা বিদ্যমান ছিল যা বিস্ফোরণের পর পূর্ণ হচ্ছে, বরং বিস্ফোরণের কারণেই বিশ্বের সৃষ্টি এবং সম্প্রসারণ তথা জায়গা ও দূরত্ব তৈরী হয়েছে।

বিশ্বের সীমানা ও ভবিষ্যৎ : বিগ ব্যাং সূত্র অনুযায়ী বিশ্বের যেহেতু একটি জন্মক্ষণ তথা নির্দিষ্ট বয়স আছে এবং আলোরও একটা নির্দিষ্ট গতি আছে, সেহেতু সদা সম্প্রসারণশীল বিশ্বের এমন একটি সীমা আছে যার বাইরের বস্তুর আলো আমাদের পৃথিবীতে পৌছতে পারেনি এবং বিশ্বের ক্রমবর্ধমান দ্রুত সম্প্রসারণের কারণে আর কখনো পৌছতে পারবে না। এর অর্থ এই যে, বিশ্বের একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত, তথা একটি অংশ মাত্র আমরা দেখতে পারি, এই সীমার বাইরের কোন অংশের কোন বস্তু বা ঘটনা আমাদের 'দৃষ্টি সীমার' বাইরে আছে এবং থেকে যাবে।

মহা বিশ্বের ভবিষ্যৎ : বিগ ব্যাং সূত্র অনুযায়ী বৈজ্ঞানিকরা মহাবিশ্বের দু'টি সম্ভাব্য

ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা অনুমান করেছেন। ১. যদি ক্রমবর্ধমান গতিতে বিশ্বের সম্প্রসারণ চলতেই থাকে তা'হলে তার ভর-ঘনত্ব (mass density) তার স্থিতিশীল অবস্থা নির্ধারক ঘনত্ব মান (critical density) এর বাইরে চলে যাবে এবং এর ফলে একটি মহা ধ্বস এর মাধ্যমে বিশ্বকাঠামো ভেঙ্গে পড়তে শুরু করবে। ফলে বিস্ফোরণের বিপরীত প্রক্রিয়া তথা একটা ক্রমশঃ সংকোচন প্রক্রিয়া চলতে থাকবে এবং অবশেষে দ্রুত গতিতে ক্ষুদ্রতর, ঘনতর, উত্তপ্ততর হতে হতে মহাসংকোচনের (Big crunch) মাধ্যমে বিশ্ব তার শুরু বিন্দুতে পৌঁছে যাবে তথা বিলীন হয়ে যাবে। ২. অপর পক্ষে বিশ্বের ভর-ঘনত্ব যদি স্থিতির মান এর নীচে বা সমান পর্যায়ে থাকে তা হলে সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া ধীরগতিতে চলতে থাকবে, কিন্তু কখনো পুরোপুরি থামবে না। কিন্তু এর ফলে উপস্থিত গ্যাস আহরিত ও নিঃশেষিত হতে থাকবে, নতুন নক্ষত্র সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে, পুরাতন নক্ষত্ররাজি তার উপস্থিত গ্যাস শেষ করে ফেলবে এবং বামুন নক্ষত্র এবং কৃষ্ণ গহ্বরের (Black hole) সৃষ্টি হতে থাকবে। ফলে বিশ্বের তাপমাত্রা কমতে থাকবে এবং এক সময় কৃষ্ণ গহ্বরও উবে গিয়ে মহা বিশ্ব এক শক্তিহীন বস্তুতে পরিণত হবে তথা বিশ্বের তখন একটি তাপ-মৃত্যু (Heat death) ঘটে যাবে।
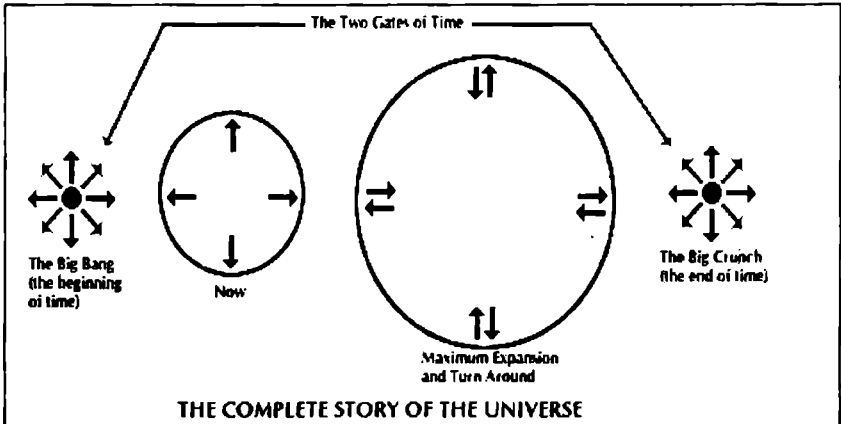
"The universe starts with a Big Bang, expands to a maximum dimension, then recontracts and collapses (to the Big Crunch); no more awe-inspiring prediction was ever made." Quotation from Charles W. Misner, Kip S. Thorne and John A. Wheeler in "Gravitation", W. H. Freeman, San Francisco, 1973, page 1196.

কুরআন ও বিগ ব্যাং সূত্র :

এই পুস্তকের আলোচনার একটি বিশেষ অংশই হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের ধ্বংস বা কিয়ামাত প্রক্রিয়ার প্রথম পর্ব এবং বইয়ের শুরুতে আমরা বিশ্ব সৃষ্টি ও মানব জাতির সৃষ্টি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনাও করেছি। তাই বিগ ব্যাং-এর অনুমান কুরআনে বর্ণিত বিশ্ব সৃষ্টি ও ধ্বংসের প্রক্রিয়ার সাথে কতটুকু সামঞ্জস্য বিধান করে তার একটি তুলনামূলক বিচারের দাবী রাখে। এই জন্যই বিগ ব্যাং সম্পর্কিত এই অনুচ্ছেদটি পুস্তকে স্থান দেয়া হয়েছে।

বিজ্ঞানের যে সকল সূত্র অজানা জগৎ বা অদৃশ্য বিষয়কে ঘিরে তৈরী হয়েছে সেগুলি মূলত অনুমানভিত্তিক, অর্থাৎ বাস্তবে প্রাপ্ত জিনিসকে নিয়ে পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত প্রামাণ্য তথ্যের মত নয়। এ ধরনের অনুমাননির্ভর অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও দার্শনিক মতবাদ আছে যা ইসলামী বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। এর সবচাইতে বড় উদাহরণ হচ্ছে ডারউইনের বিবর্তনবাদ, যার মূল বক্তব্য হচ্ছে, প্রকৃতিতে প্রথম প্রাণের উৎপত্তি ও ক্ষুদ্র প্রাণীর সৃষ্টি আপনা আপনি (কোন স্রষ্টার উপস্থিতি ছাড়া) ঘটেছে এবং পরবর্তীতে ক্রমে এক প্রাণী অন্য প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এভাবে বিবর্তনের বর্তমান অধ্যায়ে বানর প্রজাতি থেকে মানব প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে। আর প্রকৃতিতে দুর্বল প্রাণীর উপর সবল প্রাণীর কর্তৃত্ব থাকবে, ফলে সবলরাই কেবল টিকে থাকবে ইত্যাদি। এই মতবাদ প্রথমে খুব বিশ্বাসযোগ্যতা পেলেও এখন অনেকের কাছে অযৌক্তিক ও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। আর বলাই বাহুল্য, ইসলামের বিশ্বাসের সাথে এই মতবাদ শতকরা ১০০ ভাগ বিপরীত।

কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে বিগ ব্যাং-এর সূত্রের অনেক অংশই সৃষ্টি সম্পর্কিত কুরআনের বর্ণনার সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা নীচে আলোচনা করা হচ্ছে। তবে এটা মনে রাখতে হবে, বৈজ্ঞানিক কোন সূত্রই তার কার্যকারণভিত্তিক আলোচনায় আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের এবং সব সৃষ্টির পেছনে যে তাঁরই ইচ্ছা কাজ করে এর স্বীকারোক্তি বিষয়ে কথা বলে না। বিগ ব্যাং-এর বেলায়ও অসীম ক্ষমতার যে অজানা উৎসের কথা বলা হয়েছে তা যে একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কেউ নন এই স্বীকারোক্তি নেই।

তুলনামূলক চিত্র :

১. বিগ ব্যাং সূত্র : মহাবিশ্বের সৃষ্টি অতীতের একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে একটি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটেছে এবং এক নির্দিষ্ট সময় পরে আকাশমণ্ডলে গ্যাসীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ বিশ্বের উপস্থিতি অনাদিকাল থেকে বা অসীম সময় থেকে নয়।

কুরআন : বিশ্বে অনাদি বা অনন্ত কিছুই নেই, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অর্থাৎ বিশ্বের উপস্থিতি অনাদিকাল থেকে নয় এবং অনন্তকাল থাকবেও না।

৫৭:৩। "তিনিই আদি, তিনিই অন্ত...।"

কুরআন : আল্লাহ্ যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তৎক্ষণাতই তা ঘটে যায়।

২:১১৭। "তিনিই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আদি উদ্ভাবক স্রষ্টা, আর যখন তিনি কোন সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে ইচ্ছা করেন তখন তিনি কেবল বলেন 'হও' এবং তাতেই তা (তাৎক্ষণিক) হয়ে যায়।" অনুরূপ ১৬:৪০, ৩৬:৪২ ইত্যাদি।

কুরআন : সৃষ্টির শুরুর দিকে আকাশ ছিল ধূম্রপুঞ্জ।

৪১:১১। "অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ...।" (আরো দেখুন - ২১:৩০)।

২:২৯। তিনিই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তার সমস্তই; তারপর তিনি মনোনিবেশ করেন আকাশের দিকে এবং তা সাতটি আকাশে সুগঠিত করেন। এবং তিনি সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

এই আয়াতের তাফসীরে ইবনে কাসীর একটি হাদীস ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যেটির বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ্ পানি সৃষ্টি করত তা থেকে ধূম্র সৃষ্টি করেন এবং আকাশই ছিল ধূম্র, যা পরে সাত স্তরে আল্লাহ্ বিন্যস্ত করেন।

সহীহ্ মুসলিমে আবু হুরাইরা (রা) থেকে একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জিনিস এক এক দিনে (তথা এক এক সময় সীমার মধ্যে) সৃষ্টি করেছেন। (বিস্তারিত : মুসলিম - ৬৭০৭)।

২. বিগ ব্যাং : মহাবিস্ফোরণের পর মহাগতিতে বিশ্বের সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে এবং তা অব্যাহত আছে।

কুরআন : ৫১:৪৭। "***আমরাই*** নিজ ক্ষমতাবলে সৃষ্টি করেছি মহাকাশমণ্ডল এবং ***আমরাই*** এর মহাসম্প্রসারণকারী।"

৩. বিগ ব্যাং : মহাবিশ্বের বিস্তৃতি এতই ব্যাপক যে, আমরা এর এক নির্দিষ্ট সীমার বাইরের অংশসমূহ দেখতে পাই না, কারণ সেই অংশের আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছে না। মহাবিশ্বের বড় জোর একদশমাংশ বিশ্ব আমাদের কাছে দৃশ্যমান (শক্তিশালী যন্ত্রপাতির সাহায্যে)।

কুরআন : আল্লাহ্ তা'আলা সাতটি আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং এমনকি পৃথিবীর অনুরূপ সাতটি পৃথিবীও সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষের তৈরী সবচাইতে শক্তিশালী যন্ত্রপাতির সাহায্যেও দৃশ্যমান আকাশের মধ্যে আমরা ভিন্নতার পরিচায়ক একাধিক কোন সীমারেখা খোঁজে পাই না যাতে আমরা প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি আকাশমণ্ডল সাব্যস্ত করতে পারি। অর্থাৎ কাছে দৃশ্যমান আকাশই হচ্ছে প্রথম আকাশ এবং বাকী ছয়টি আকাশ আমাদের 'দৃষ্টি সীমার' বাইরে, যদিও বিজ্ঞানও সেগুলির উপস্থিতি যুক্তির মাধ্যমে স্বীকার করছে।

২:২৯। তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে (তার) সমস্তই সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনঃসংযোগ করেন এবং তা সপ্ত আকাশে সুবিন্যস্ত করেন...।

২৩:১৭। ***আমরা*** তো তোমাদের উপরে সৃষ্টি করেছি (আকাশের) সাতটি স্তর (একের উপর আরেকটি করে) এবং ***আমরা*** সৃষ্টির বিষয়ে কখনো অসতর্ক নই।

৩৭:৬। নিশ্চয় ***আমরা*** (পৃথিবীর) নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির (সুষমা) দ্বারা সুশোভিত করেছি।

৬৫:১২। আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং (সপ্ত) পৃথিবীও, ওগুলোর অনুরূপ ভাবে। (অনুরূপ - ১৭:৪৪, ৬৭:৩, ৭১:১৫ ইত্যাদি)।

৪. বিগ ব্যাং : মহাবিশ্বের একটি সম্ভাব্য পরিণাম হচ্ছে, একটি মহাধ্বংস শুরু হওয়া এবং এর ফলে দ্রুত তার শুরুর অবস্থার দিকে ফিরে যাওয়া (Cosmic crunch বা মহা সংকোচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে)

কুরআন :

২১:১০৪। (সেই দিনের কথা স্মরণ কর) যে দিন ***আমি*** আকাশকে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর (যেমন দলীল, ফরমান ইত্যাদি);

যেভাবে ***আমরা*** সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবেই পুনরায় ***আমরা*** সৃষ্টি করব; (এ একটি) প্রতিশ্রুতি (যা) পালন করা ***আমাদের*** উপর কর্তব্য, ***আমরা*** এ কর্তব্য পালন করব।

৩৯:৬৭। (মূর্খ পৌত্তলিক) লোকগুলো আল্লাহ্ তা'আলার মূল্যায়ন সেভাবে করেনি যেভাবে মূল্যায়ন করা তাঁর প্রাপ্য; কিয়ামাতের দিন গোটা পৃথিবীই থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে ভাজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে (অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব থাকবে একমাত্র তাঁরই আয়ত্ত ও কর্তৃত্বে); পবিত্র ও মহান তিনি, ওরা (মুশরিকরা) যা কিছু (তাঁর সাথে) শরীক করে তা থেকে তিনি ঊর্ধ্বে।

তবে এখানেও লক্ষণীয় যে 'কসমিক ক্রাঞ্চ' বা মহাসংকোচনের প্রক্রিয়া অবধারিত - এ কথা বিজ্ঞান অনুমান করলেও এর মূল কারণ বিজ্ঞান অনুমান করতে পারে না। মহাধ্বস শুরু প্রক্রিয়া এবং বিশ্বের ধ্বংস পর্বের পর আবার নূতন বিশ্বের সৃষ্টি শুরু - এ সবের পেছনে আছে ইস্রাফীল (আ) এর শিঙ্গায় দেয়া মহা নিনাদের ফুৎকার (৩৯:৬৮), আর তিনি তা করবেন একমাত্র আল্লাহ্রই ইচ্ছা ও নির্দেশে। আর বিশ্ব যে মহিমান্বিত আল্লাহ্র 'হাতের মুঠোয়' থাকবে এটাই বিশ্বের মহাসংকোচনের কুরআনভিত্তিক আভাসও বটে।

দ্রষ্টব্য : ইন্টারনেটের ইসলামিক ওয়েব সাইটগুলির অধিকাংশেই দেখা যায় যে, বক্তারা মন্তব্য করেছেন, আমাদের কুরআনে 'বিগ ব্যাং'-এর কথা ১৫০০ বৎসর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে! (এটা নিজেদের বিজ্ঞান বিমুখতার দুর্বলতাকে ঢাকতে গিয়ে কুরআন নিয়ে গর্ব করার এক ধরনের প্রচেষ্টা বটে।) প্রকৃতপক্ষে এধরনের সরাসরি সমীকরণ তৈরী করা ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ গায়বী বা সম্পূর্ণ অজানা বিষয়ে মানুষের ধারণা কেবল ধারণাই এবং মানুষের অনুমানের সাথে কুরআনের বর্ণনার কিছু সামঞ্জস্য খোঁজে পাওয়া গেলেও প্রকৃত তথ্য কেবল আল্লাহ্ই জানেন।

সমাপ্ত

এই লেখকের অন্যান্য বই

১। জামা'তে নামায পড়া : গুরুত্ব ও মর্যাদা
এবং নামায পড়ার খুঁটিনাটি নিয়ম-কানুন

২। চান্দ্রমাসের ইসলামী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব
বনাম 'চান্দ্রমাস' নামক বই এর বিভ্রান্তি